

# দয়াল বন্ধুর ভ্রমণ কথা- ২০২৪

শৈব তীর্থ ( ইন্দোরের দিকে ) ও প্রয়াগ কুন্ড

আসাম-শিলং-২০২৩, নৈনীতালের দিকে

রাঁচী , কাশ্মীর, বারানসী-২০১৯



## শৈব তীর্থে ভ্রমণ ১

২০২৪ সালের ১৬ই ডিসেম্বর শুরু হল আমাদের শৈব তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ। এবার যাত্রা হাওড়া স্টেশন থেকে। যাবো উজ্জয়িনী (মহাকালেশ্বর), ইন্দোর, ওঙ্কারেশ্বর, আর ফেরার পথে কিছু সময়ের জন্য প্রয়াগ। এসব টিকিট সেই চার মাস আগে যখন ট্রেনের অগ্রিম টিকিট কাটতে পারতাম সেই সময় কাটা। তারপর তো দু'মাস আগে টিকিট কাটার নিয়ম হয়ে গেল। হাওড়া থেকে উজ্জয়িনী, শিপ্রা এক্সপ্রেসে। সন্ধ্যা পৌনে ছয়টায় ছেড়ে পরদিন রাত দশটার আগে পৌঁছয়। আমি নতুন জায়গায় বেশী রাত্রে গিয়ে পৌঁছনো এড়িয়ে চলতে চাই; কিন্তু এই রাস্তায় এ ছাড়া গাড়ী নেই।



শিপ্রা এক্সপ্রেস

ট্রেন এক দুই ঘন্টা দেরী করে পৌঁছবে, এটাই দস্তুর। তাই টিকিট কেটেই দেখে নিলাম, উজ্জয়িনী স্টেশনে রিটায়ারিং রুম আছে কি না। আছে দেখেই, সন্ধ্যা আটটা থেকে পরদিন সন্ধ্যা আটটা পর্যন্ত বুক করলাম, একটি নন এসি রুম। মাত্র ৩৩৩ টাকা। এত সস্তা হওয়ায় একটু খুঁতখুঁত করছিল মন; পৌঁছে দেখলাম, ঠিকই আছে। আর ট্রেন গোটা রাস্তা ঠিকঠাকই চলল। মাঝে কিছু সময় মিনিট কুড়ি লেটে চললেও, উজ্জয়িনী স্টেশনে পৌঁছে গেল, আট মিনিট আগেই। আমরা এবার দুই Senior Citizen রওয়ানা দিলাম। বিকেল চারটা নাগাদ রওনা দিয়ে, দমদম মেট্রো ধরলাম, চারটে পনের মিনিট নাগাদ। ধর্মতলায় মেট্রো পাল্টে হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে গেলাম, পাঁচটা দশে। ধর্মতলায় মেট্রোতে ওঠার আগেই দেখলাম বেশ ভিড়। দুটি স্টেশন হলেও বেশ চাপাচাপি ভিড় হয়ে গেল। হাওড়ায় শিপ্রা এক্সপ্রেস আট নম্বর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে ছিল।



আমরা উঠে ব্যাগপত্র রাখার জায়গা পেয়ে গেলেও, দশ মিনিট পর যারা উঠল তাদের বড় বড় ট্রলি ইত্যাদি রাখা নিয়ে বেশ সমস্যা হল। লোকজন কতো বড় বড় বোঝা নিয়ে ট্রেনে ওঠে, দেখলে আমরা অবাক হয়ে যাই। পরে জেনেছি, এক মহিলা মেদিনীপুরের বাড়ী থেকে ভূপালের কোয়ার্টারে যাচ্ছেন; ট্রলিব্যাগ ভরে চাষের বেগুন, বাঁধাকপি, ফুলকপি সব নিয়ে

চলেছেন। সাথে একটি বছর চারেকের বাচ্চা, তার শীতের পোশাক ইত্যাদি তো আছেই। বাচ্চার বাবা বেচারার শাস্তিটা ভেবে দেখুন। ওরা মিলিটারির চাকরীর জন্য বাইরে বাইরেই থাকে। আরও প্রায় একই রকম আর একটি পরিবারও আমাদের সহযাত্রী। ওদের বাচ্চাটা আরও ছোট। কিন্তু সমস্যা হল, আমরা দুই সিনিয়র সিটিজেন নীচের দুটি বার্থ নিয়ে বসে গেছি। ওরা মিডিল আর আপার। বাচ্চা নিয়ে উপরে শোয়া বেশ সমস্যা। ছোট বাচ্চার মা এই প্রথম বাচ্চা নিয়ে ট্রেনে চলেছে। যে কাজটা ওর স্বামীর একটা নিরীহ অনুরোধে হয়ে গেল; সেইটা নিয়ে আমার স্ত্রীর মেজাজ বিগড়ে দিয়েছিল। আজই সকালে শ্রীশ্রী মা সারদার একটি অমর পরামর্শের আলোচনা শুনছিলাম। দোর্দণ্ড প্রতাপ জমিদার জেলেদের মাছ ধরতে বারণ করে দিলেন। জেলেরা মাছ ধরার কাজ না করলে সপরিবারে মারা যাবে। ওরা এসে শ্রীশ্রী মাকে বিপদের কথা জানাল। মা বললেন, জমিদারের সাথে ঝগড়াঝাঁটি না করে, ভালো করে বুঝিয়ে বল, উনি ঠিকই বুঝবেন। জেলেরা জমিদারের কাছে সবিনয়ে অনুরোধ করায় তিনি আবার মাছ ধরার অনুমতি দিলেন। যে কাজ অনুরোধে হয়ে যায়, সেটাই তর্কাতর্কি করলে জটিল হয়ে যায়। এই কম বয়সের বাচ্চার মা ভেবেছিল, বাচ্চা নিয়ে উঠেছে, তাই তার অধিকার, নিচের বার্থে যাবে। রেলের নিয়মে তো সেরকম কিছু কথা নেই। টিকিট কেনার সময়ই কে কোন বার্থে যাবে জানিয়ে দিয়েছে। এবার আমি সহানুভূতি দেখিয়ে নিচের বার্থ ছেড়ে দিলাম, সেটা অন্য কথা। সবাই তো ছাড়ে না। না ছাড়লে কারো কিছু বলার নেই। আমার সাংঘাতিক অসুস্থ ছেলেকে নিয়ে রাতের ট্রেনে, মেঝেতে চাদর পেতে শুইয়ে কলকাতা এনেছিলাম, মালদা থেকে। সম্পূর্ণ রেলের ভুলে হয়েছিল গুগোলটা। কোন যাত্রী একটা বার্থ ছাড়েনি। এমনকি টিটি, দুটি বার্থ টাকা নিয়ে অন্য লোককে দিয়ে দিয়েছিল। ভুলেই গিয়েছিলাম সে সব বাজে অভিজ্ঞতা। এরকম কেউ কেউ খুঁচিয়ে মনে করায়। যাই হোক, আমাকে একবার বলাতেই, বাচ্চার জন্য নিচের বার্থ ছেড়ে দিলাম। এটা কোন মহানুভবতা নয়। প্রভুর কৃপায় আমি এখনও যথেষ্ট শারীরিক ভাবে সুস্থ আছি। নিজেই অক্ষম হলে তো, অন্যের করুণার উপর নির্ভর করতে হবে। এই বাচ্চা দুটিকেই আমি আগের লেখায়, বাল গোপাল বলে উল্লেখ করেছি। [ নিতাইদা-৪ লেখা থেকে ঃ - প্রায় চব্বিশ ঘন্টা হল হাওড়া স্টেশন থেকে ট্রেনে রওনা দিয়েছি। সাথে দুটি বাল গোপাল চলেছে। এরা কেউ সফর সঙ্গী হলে, ট্রেনের দীর্ঘ ভ্রমণ আনন্দময় হয়ে যায়। সেও এক রকম, বাল গোপাল এর কৃপা। এদের একজনের “বালভাসিতম অমৃতম” শুনতে শুনতে চলেছি। ওর সাথে পাশের একটি কিশোরী কন্যা বেশ ভাব জমিয়ে নিয়েছে। সেই দিদির কোলে বসে, এই শিশুটি হঠাৎ বলল, আমি হাত দিয়ে বাঁশী বাজাতে পারি। ওর ঐ কথাগুলি এতই অস্পষ্ট যে, মেয়েটি বা তার মা বুঝতে পারছিল না। দুই তিন বার কি করতে পারিস, জিজ্ঞেস করায় ও বলল, “ কিন্নোর মতো বাচি বাজাই। ” ঐ বাঁশী আর কিন্নো মিলিয়েই বুঝলাম , এ সেই পরম করুণাময় শ্রী কৃষ্ণের বাঁশীর কথা বলছে। সে বাঁশী তো কোন সুদূর অতীত থেকেই বেজে চলেছে; শুনতে পায় কজন? যে শুনতে পায়, সে তো কৃপা ধন্য। ]



ওরা দুজনও নতুন রেল যাত্রার অভিজাত বুমতে বুমতে ঘুমিয়ে পড়ে। পরদিন সকালে উঠে ওরা দু'জন আশপাশের লোকজন সকলকে সারাদিন মাতিয়ে রাখে। একেবারে ছোট্টা কথাই বলতে শেখেনি। সেও আমাকে তার দাদু মনে করে আমাকে একেবারে আপন করে নিল। একসময় তো ওদের দুজনের সাথে আমাকেও বেলুন নিয়ে খেলতে হল। একটা বেলুন চুপসে না যাওয়া পর্যন্ত আমার ছুটি হল না। “কিল্লোর বাচি” বাজানোর গল্প তো বলেছি। সেই কিল্লো ভক্ত আমাদের থেকে ঘন্টখানেক আগে নেমে গেল। ছোট্টা তার আগেই মায়ের সাথে ঘুমিয়ে পড়েছে। আমরা উজ্জয়িনী স্টেশনে পৌঁছে, এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে Retiring room পেয়ে গেলাম। দোতলায় উঠে, মাসিকে কাগজ দেখাতে, বলল , নিচে গিয়ে Enquarry তে নাম লিখিয়ে আসুন। আমি নীচে নেমে গেলাম। ঐ ছোট্ট খুপড়ি ঘরে আগেই জন তিনেক যাত্রী ঢুকে ছিল। একজন রেলের কর্মচারি ওদের সাথে কথা বলছেন , শুনতে পাচ্ছিলাম, কিন্তু তাকে দেখা যাচ্ছিল না। একজন বেরোনের পর আমি মুখ বাড়তেই সেই কর্মচারি বললেন, আপনার আছে? আমি আমার ছাপিয়ে নিয়ে যাওয়া বুকিং এর কাগজটি ওনার হাতে দিতেই, উনি সেটা আগের দুইজনকে দেখিয়ে বললেন, এই রকম একটি কাগজ বা মোবাইলে পাঠানো বার্তা দেখাতে হবে। আমার আধার কার্ড মিলিয়ে খাতায় লিখে নিলেন। আমার নাম ঠিকানা খাতায় লিখে সহ করে দিতে বললেন। প্রথমে থাকা কম বয়সের মেয়েটি আপ্রাণ চেষ্টা করে গেল বোঝাতে যে, ওর কাছে ঐ রকম কোন বার্তা আসেনি। ওর মোবাইলে আসা একটি কোন বুকিং নম্বর দিয়ে কিছু করা যায় কি না সেই চেষ্টা চলছে দেখে আমি বেরিয়ে এলাম। স্টেশনের বাইরে অনেক অটো রিক্সা দাঁড়িয়ে আছে, উপর থেকেই দেখেছি। কয়েক পা এগিয়ে ওদের একজনের সাথে কথা বলে নিলাম। জানলাম, ভস্মারতি দেখতে হলে রাত দুটোয় বেরোতে হয়। সেই মহাদর্শনীয় কর্মকাণ্ড দেখতে হলে, মাস দুই তিন আগে থেকেই অনলাইনে টিকিট কাটতে হয়। সেরকম কোন পূণ্য লাভের আশায় আমরা আসিনি। তাই ভোরে উঠে মন্দিরের দিকে যাবো ঠিক করে শুয়ে পড়লাম। কদিন আগে এদিকে থাকা এক ভদ্রলোকের কাছে জানতে পেরেছিলাম, ইন্দোরের দিকে দারুণ ঠাণ্ডা পড়ে। উজ্জয়িনীতে সেরকম ঠাণ্ডা পেলাম না। জানালা দরজা বন্ধ Retiring room এ একটা পাতলা কম্বলেই বেশ ভালো ভাবে রাত কেটে গেল।

আমাদের অভ্যেস মত ভোর চারটে নাগাদ ঘুম থেকে উঠে বেরনের জন্য তৈরী হয়ে গেলাম। স্টেশন চত্বর থেকে বেরিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা টোটো ধরে ছুটলাম মহাকাল দর্শনের জন্য। টোটো একটা চৌরাস্তায় নামিয়ে হাঁটতে বলল। এবার শুরু হল পূজার ডালা বিক্রির দোকান। এটা আমরা জানি; সব বড় মন্দিরের সামনে এরকম, ডালা বিক্রির দোকান অন্তত আধা কিমি আগে থেকেই শুরু হয়। ভক্তদের পায়ের দিকে তাকিয়ে হাঁটতে থাকলে বোঝা যায়, জুতো জমা রাখার জায়গা সামনে আছে। আমরা সাতাশ নম্বর দোকানে জুতো খুলে, ডালা কিনে নিলাম। এবার চললাম পাথর বাঁধানো রাস্তা দিয়ে। একটা ফাঁকা মাঠ মত জায়গার সামনে বিরাট বড় টিভিতে ভেতরের ভঙ্গি আরতি দেখাচ্ছে। অনেকে বসে দাঁড়িয়ে দেখছে। আমরা না থেমে এগিয়ে গেলাম। যারা বসে টিভিতে দেখছেন, তাঁদের জন্য বেশ কিছু চকচকে স্টিলের বসার জায়গা করা হয়েছে। ওরা সম্ভবত ভোর তিনটে থেকেই বসে দেখছেন।



আমরা একটি আধুনিক হলের ভিতরে ঢুকে, স্টেনলেস স্টিলের বেড়ার মধ্যে ঢুকে গেলাম। হলে আমাদের সামনে অন্তত হাজার তিনেক লোক দাঁড়িয়ে আছে। পিছনে আরও হাজার পাঁচ সাত লোকের দাঁড়ানোর মত জায়গা খালি ছিল। আধ ঘন্টার মধ্যে প্রায় গোটা হল ভরে গেল। আমরা আরও মিনিট চল্লিশ দাঁড়িয়ে, টিভিতে আরতি দেখলাম।



আরতি শেষ হল ছটার পর। তারপর সব পরিষ্কার করে, শিব লিঙ্গের উপর থেকে রূপার মুকুট সরিয়ে রাখল। একটি রূপার কলসিতে জল ভরে শিব লিঙ্গের উপর ঝুলিয়ে দেওয়া হল। সেই কলসীর তলার ছিদ্র দিয়ে জল পড়তে থাকল। একটা মোটা পিতল বা তামার পাইপ কলসির উপর জুড়ে দেওয়া হল। সাড়ে ছয়টা নাগাদ হলের লোকেদের জন্য ভেতরে যাওয়ার গেট খুলে দিল। এবার নিশ্চয়ই দর্শন হবে। ১৯.১২.২৪.

## শৈব তীর্থে ভ্রমণ 2

সাধারণত আমি এরকম লম্বা লাইন দিয়ে, ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে কোন মন্দিরে পূজা দিতে, বা দর্শন করতে সময় দিই না। পূণ্য লাভের আশায় কোন তীর্থেও যাই না। এত বড় দেশের নানান প্রান্তে শত শত মন্দির, মসজিদ, গুরুদ্বারা, গীর্জা আছে। কটিই বা আমরা যেতে পারি? কিন্তু যে কটি জায়গায় আমি পৌঁছতে পেরেছি, সেখানে “ পূজা চড়ানো” , প্রার্থনা, বা পর্দা চাপানো, কোন কিছুই আমি করিনি। আবার আমার স্ত্রী যেখানে যা পূজা ইত্যাদি দিয়েছে, আমি বাধা দিয়ে নাও করিনি। এই তো গত বছর, কামাক্ষা মন্দিরে পূজা দেওয়ার লাইনে ঘন্টা দুই দাঁড়িয়ে, আমি বেরিয়ে এসেছিলাম। আমার স্ত্রী, দলের বাকীদের সাথে মন্দিরে ঢুকে পূজা দিয়ে, হোটеле ফিরল বিকেল পাঁচটা নাগাদ। আর আমি একা একাই ঘুরলাম, কামাক্ষা পাহাড়ের অন্য কিছু মন্দির দেখলাম, ভান্ডারায় খিচুড়ি ভোগ খেলাম, লঞ্চে চেপে উমানন্দ দেখে হোটলে ফিরলাম, চারটার আগেই। একটা জায়গায় বেড়াতে গিয়ে, মাত্র একটি মন্দিরে ঢুকে পূজা দিয়ে একটি গোটা দিন খরচ করতে রাজী নই। আমাদের দলের বাকী প্রায় তিরিশ জন জানলোই না, কামাক্ষা পাহাড়ের উপর থেকে নিচে ব্রহ্মপুত্র নদ কেমন দেখতে।



উমানন্দ যাওয়ার ঘাটে

চলুন এবার আমরা সবাই মহাকাল দর্শনের জন্য পা চালিয়ে ভেতরে যাই। নীচের হল থেকে দেড় দুই তলা উপরে উঠে, কিছুটা নিচে নেমে, সুন্দর করে বেড়া দিয়ে দিয়ে লাইন ঠিক করে রাখা। সেই পথে ভেতরে চললাম। আমাদের আগে একজনকে হুইল চেয়ারে বসিয়ে ঠেলে নিয়ে যাওয়াও দেখলাম। লোকে দুর্গম হিমালয়ের রাস্তায়, মানুষের পিঠে চেপেও তীর্থ করতে চলেছে, এরকমও তো দেখেছি। পূণ্য লাভের কি প্রবল বাসনা মানুষের! এদিকে আমার মত অর্বাচীন, ভ্রমণ করতে যাওয়া হজুগে লোকও আছে। যদি এরকম উটকো লোকগুলো কোন ভাবে বাছাই করে বাইরেই আটকে রাখার ব্যবস্থা করা যেত, তাহলে আসল ভক্ত লোকগুলি একটু আরামে পূজা দিয়ে স্বস্তি পেতো। এই বাছাই করা ব্যাপারটা মনে হল , এখন “ তপোভূমি নর্মদা” তীরে বসে আছি বলেই। সেই ১৯৫২ সাল নাগাদ শৈলেন্দ্র নারায়ণ ঘোষাল শাস্ত্রী মশাই এই নর্মদার পাড়ে পাড়ে পরিক্রমা করছিলেন। এই ওমকারেশ্বর মন্দিরের চাথালে দেখা পেয়েছিলেন, মহাত্মা প্রলয় দাস মহারাজের। ( ১৯.১২.২০২৪, আজ আমি সেই ওমকারেশ্বর মন্দিরে ঢুকে ভিড় বাড়িয়ে এলাম), কোথায় কি চাথাল ! সব বেড়া দিয়ে লাইন করার ব্যবস্থা। হাজার হাজার মানুষের হটগোলে, কোন কোনায় বসে ছিলেন মহাত্মা প্রলয় দাসজী বোঝার কোন প্রশ্নই নেই। এই মহাত্মা

জানতেন, আর কয়েক মাইল পশ্চিমে এগিয়ে গেলেই , শৈলেন্দ্র নারায়ণকে কঠিন পরীক্ষায় পড়তে হবে। তাই তিনি “বাঘা পরিক্রমাকারিকে” মহর্ষি দণ্ডীকৃত শিবের সহস্র নাম মুখস্থ করে তারপর এগোতে বলেছিলেন। ওটা বলতে না পারার জন্য, শত শত শতের পরিক্রমাকারীকে ফেরৎ করে দেওয়া হত। এখন তো সব মন্দিরেই “ ভি আই পি দর্শনের” ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই মহাকাল দর্শনের জন্যও সেরকম, বেশী টাকা দিয়ে কম লাইনের বন্দোবস্ত আছে। আমি জানতাম, কিন্তু খোঁজ করে দেখিনি। পরে সেই সব “ টিকিট কেনার, কম্পিউটারাইজড কাউন্টার” দেখেছি, বেরনোর রাস্তায়। সে যাই হোক, ভিড়ের পিছু পিছু এগিয়ে আমরাও দর্শন করে নিলাম। হল থেকে এগিয়ে , দর্শন পর্যন্ত প্রায় আধ ঘন্টা মত লাগল। আঠারোই ডিসেম্বর ভোর রাত্রে বেশ ঠাণ্ডা ছিল উজ্জয়িনীতে; তাই সবমিলে ঘন্টা দেড় দুই মহাকাল মন্দির চত্বরে থাকলেও কোন কষ্ট হয়নি। গরমের সময় কিন্তু বেশ কষ্টকর হবে ব্যপারটা। হলে, ভেতরের লাইনের জায়গায়, অনেক ফ্যানের ব্যবস্থা আছে। আমাদের জন্য ফ্যান চালাতে হয়নি। কিন্তু উনিশ তারিকেই , ওঙ্কারেশ্বর মন্দিরের লাইনে ফ্যান চলছে; তবুও অনেকে ঘেমে গেছে দেখলাম। এই মহাকাল মন্দির নিয়ে সরকারের খুব ভালো পরিকল্পনা আছে। এখনও অনেক সম্প্রসারণের কাজ চলছে। মূল মন্দির থেকে বেরিয়ে অনেকটা ফাঁকা চত্বর আছে। তার আসে পাশে অন্তত গোটা দশেক ছোট মন্দির আছে। অনেকে সেই সব মন্দিরেও পূজা দিচ্ছেন। এবার একটু ভেতরের কথা বলি। দশ হাজার লোককে দেড় দুই ঘন্টায় , একটি শিবলিঙ্গ দর্শন করিয়ে, পদপিষ্ঠ না হয়ে বেরিয়ে আসার ব্যবস্থা। অর্থাৎ, আপনি প্রায় একশ ফুট দূর থেকে এক ঝলক দেখতে পাবেন। আগেই হলে দাঁড়িয়ে, লাইভ টেলিকাস্ট দেখে জেনে গিয়েছিলাম, তাই বুঝলাম, ঐ তো রূপোর কলসীর নীচে ফুট দুই লম্বা, মহাকাল শিবলিঙ্গ।



পেঁচানো লাইনে এগোতে গিয়ে এক জায়গায় দেখেছি, দেড় দুশো লোকের বসার মত ধাতব আসন আছে। সেটা আরো দশ ফুট উপরে। তাহলে , রাত তিনটে থেকে একশ দশ ফুট দূর থেকে কিছু মানুষ , সরাসরি ভগ্নারতি দেখেছেন। আর আমার মত হাজার হাজার মানুষ, টিভিতে লাইভ টেলিকাস্ট দেখে, একটু কম পূণ্য পেয়েছি। টিভিতে ক্রিকেট খেলা দেখার মত, এখানেও আমার মনে হয়েছে, টিভিতে অনেক পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। প্রায় এক কিমি হেঁটে, মন্দিরের আরেক দিক দিয়ে বেরিয়ে, আমাদের জুতো রাখা সেই সাতাশ নম্বর দোকানে পৌঁছতে, বার চারেক লোকজনকে জিজ্ঞেস করতে হল। খালি পায়ে পাথুরে রাস্তায় হেঁটে ঘুরে এসেছি, আমার মত কড়া পরা পা না হলে কিন্তু কষ্ট আছে। অবশেষে মন্দির চত্বরের বাইরে , রাস্তার দুই পাশে সারি সারি দোকানের একটিতে

টুকে প্রাতরাশ সারলাম। যেখানে ভোরে টোটো থেকে নেমেছিলাম সেখান থেকেই আবার স্টেশনে ফেরার টোটো ধরলাম। ভাড়া এবারও মাথা পিছু কুড়ি টাকা। উজ্জয়িনী স্টেশনের Retiring room এ ফিরে, গরম জলে স্নান করে আবার বেরোলাম, উজ্জয়িনী শহর দেখতে। স্টেশন এর বাইরে রাস্তায় এসে, একটু দরদাম করে পাঁচশ টাকা দিয়ে একটা অটো ভাড়া করলাম। একটু বয়স্ক অটো চালক। ধীরে সুস্থে অটো চালান। সকালের দিকে রাস্তা ফাঁকা ফাঁকা ছিল। প্রথমেই যেন একটু পাড়ার ভেতরের রাস্তা দিয়ে চললাম। বর্ধমান বা কৃষ্ণনগর জেলা শহরের মতই বাড়ী ঘর আর রাস্তা ঘাট। প্রথমে গেলাম, পাশাপাশি কালী আর গনেশ মন্দিরে। যে কোন মন্দিরের সামনে যেমন পূজার ডালার দোকান লাইন দিয়ে থাকে, এখানেও তেমন। আমরা মন্দিরের মূল গেটের বাইরে জুতো খুলে, মন্দির চত্বরে ঢুকলাম। এই জুতো খুলে ঢোকান সময়ই মনে পড়ল, আমার “শাকালু নিতাই দাদার” গল্পে একটা মজার কথা বলতে ভুলে গেছিলাম। দাদার প্রায় বছর পঞ্চাশ আগের একটা টোটকা আমি এখনও ভুলিনি। মন্দিরে, কীর্তন এর আসরে বা ঐ রকম কোন জায়গায় সবাই জুতো খুলে ঢোকে। কিছু লোক জুতো চুরি করতে যায়। একটা হয়তো খুব পুরোনো চটি পায়ে দিয়ে গেল। বেরনোর সময়, কোন ভালো জুতো পছন্দ হলে, সেটাই পায়ে দিয়ে বাড়ী চলে যায়। এক্ষেত্রে নিজের জুতো জোড়া পাশাপাশি সাজিয়ে না রেখে একটু দূরে দূরে রাখলে, সাধারণত চোরের চোখে পড়ে না। নিজে তো জানি কোনটা কোথায় রেখেছি; তাই নিজের জুতো খুঁজে বের করতে অসুবিধা হয় না। এই মন্দিরের চত্বরেই প্রথম দেখলাম, দুই দিকে দুটি সিমেন্টের বা পাথরের দীপ জ্বালানোর প্রায় কুড়ি পাঁচশ ফুট উঁচু দীপদানি। এগুলির ঠিক কি নাম আমি জানি না। এক একটিতে শ’খানেক প্রদীপ জ্বালানোর ব্যবস্থা। ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত কালো পোড়া তেলে একেবারে জবজব করছে। এরকম জিনিস পরে অনেক মন্দিরেই দেখেছি। কাল ভৈরব মন্দিরের চত্বরেরটি সবথেকে উঁচু।



একটি ছেলে ওটার গায়ের থেকে পোড়া তেল ঘসে ওঠাচ্ছে। একটি কর্মচারি ছেলে লাইন ঠিক করা ইত্যাদি করছিল। ওকে জিজ্ঞেস করে জানলাম, ঐ প্রদীপ দেওয়ার হাতের মত বেরিয়ে থাকা পাথরের খাঁজে খাঁজে পা দিয়ে উপর উঠে তেল ভরা আর প্রদীপ জ্বালানোর কাজ করা হয়। বিখ্যাত মহাকাল মন্দির চত্বরে এরকম বাতিদান দেখিনি। কালিকা মন্দির আর গণেশ মন্দিরে ঢুকে কয়েকটা ছবি তোলা হল। গণেশ মন্দির চত্বরে গোটা পাঁচ ছয় তাগড়াই গোরু পোষা আছে। একজন টাটকা ঘাসের আটি বিক্রী করছে। লোকে প্রায় লাইন দিয়ে, সুন্দর করে কুচিয়ে রাখা ঘাস, এক বাটি করে কিনে গরুদের খাওয়াচ্ছে। কেনার জন্য QR কোড রাখা আছে। নগদ টাকা না দিয়ে, অনলাইনেই কেনা যায় (? পূণ্য)!



গনেশ মন্দির চত্বরে

কালী মন্দিরের গেটের বাইরে যে সব পূজার ডালা বিক্রির দোকান আছে, সেখানে ফুল, নারকেল, নকুল দানা, মুড়ি, কিসমিসের সাথে লম্বা লম্বা পাতি লেবুর মালা বিক্রী করছে। ওদের কাছে জানা গেল, ওগুলি ১০৮ মুন্ডের মালার প্রতীক; কালী পূজার সামগ্রী। যে দেশে শত শত লিটার দুধ নদীর জলে ঢালা হয়, সেখানে শত শত পাতি লেবু মালা গেঁথে নষ্ট করবে, সে আর বিচিত্র কি!



লেবুর মুন্ডমালা

এবার চললাম, আর এক বিখ্যাত মন্দির, কাল ভৈরব। মিনিট পনের অটো চলেই পৌঁছে গেলাম। সেই একই বন্দোবস্ত। বিরাট মাঠের ভেতর অটো পার্কিং করে ড্রাইভার বললেন, জুতো অটোতে রেখেই মন্দিরের দিকে এগিয়ে যান। অটো থেকে নামার সাথে সাথেই পূজার ডালার দোকানের ছেলে এসে, ডালা কিনে ঢুকতে সাধাসাধি শুরু করলো। আমরা এখানে আর ডালা নিলাম না। অটোর ড্রাইভার নামার সময় বলেছিলেন, এতো ফাঁকা মাঠ দেখছি, দু ঘন্টা পর এখানে মেলার মত ভিড় হয়ে যাবে। প্রথমে কিছুটা পাথুরে রাস্তায়, তারপর লাল কাপেট বিছানো, বেড়ার মধ্যে দিয়ে আঁকাবাকা রাস্তা ধরে হনহনিয়ে এগিয়ে চললাম। মন্দিরের মূল গেটের কাছে পর্যন্ত বেশ ফাঁকা ফাঁকা রাস্তায় যেতে পারলাম। শেষ পঞ্চাশ ফুট সিঁড়ি ইত্যাদিতে লাইনের পিছনে দাঁড়িয়ে পড়লাম। ঐ

রাস্তাটুকু পেরিয়ে মন্দিরের দরজায় পৌঁছতে মিনিট পনের লাগল। আমি এক সেকেন্ডে দেখে নিয়েছি, পিতলের একটি মুখমন্ডল, বাঘের মতো বললে কিছুটা কাছাকাছি হয়। আমার স্ত্রী কিছুই দেখতে পারেনি।



কাল ভৈরব মন্দির

লাইনের বাইরে বেরিয়ে ছোট্ট চত্বরে কয়েক মিনিট থেকে মন্দিরের পিছন দিকে বেরনোর রাস্তা ধরে সেই অটো রাখার মাঠে ফিরে এলাম। পরে একটি দলের কাছে শুনলাম, কাল ভৈরব মন্দিরে ঘন্টা তিনেক লাইন দিয়ে পূজা দিয়েছে। এর পরের মন্দির, শিপ্রা নদী পেরিয়ে মঙ্গলনাথ মন্দির। ব্রীজের উপর থেকে শিপ্রা নদী দেখলাম; জল আদৌ বয়ে যাচ্ছে বলে মনে হল না। নদীর অন্য পার থেকেই দেখেছি, মন্দিরের চূড়া অসম্পূর্ণ। মন্দিরে ঢোকান সময় এখানে আবার পান্ডা পুরুতের ছড়াছড়ি। সবাই রঙ্গিন ধুতি পাঞ্জাবি পরে, তিলক কেটে, পূজা করানোর খদ্দের পেতে ব্যস্ত। মন্দিরের দোতলায় উঠে বোঝা গেল ওদের পেশাতেও স্টেশনের বাইরে যাত্রী ধরতে ব্যস্ত অটো চালকদের মত চাপ আছে। দোতলার বিশাল চাখাল জুড়ে কয়েকশ পণ্ডিত (পুরুত) আসন পেতে, পূজা করানোর দোকান নিয়ে বসে গেছে। অর্ধেকের বেশি পুরুত খদ্দের পেয়ে গিয়েছে; চলছে জোর পূজা পাঠ। খুব চকচকে একটি করে পিতল বা তামার ঘট, দেখার মত।



তিনতলায় পূজা দেওয়ার চেষ্টা, বেড়ার মধ্যে ঢুকে লাইন। শ'দুই তিন লোক লাইনে দাঁড়িয়ে গুতাগুতি করছে দেখে আমরা নীচে নেমে এলাম। আমার স্ত্রী একটি জায়গায় দানপেটি দেখে, একটা দশ টাকার কয়েন ফেলে দিল। ঐ রাস্তায় সামান্য কিছু এগিয়েই সন্দীপনি আশ্রম। এটি শ্রীকৃষ্ণ আর বলরামের গুরুর বাড়ী। ছোট্ট গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেলাম। বেশ ছায়া সুনিবিড় আশ্রম। ভেতরে গোটা দুই তিন ছোট্ট মন্দিরও আছে। এছাড়াও

শ্রীকৃষ্ণের পাঠশালা বলে একটি ছোট্ট মিউজিয়ামও আছে; সেখানে বেদ , রামায়ণ, পুরান ইত্যাদি হিন্দি বা সংস্কৃত বই বিক্রী করছে।



আশ্রমের উল্টো ফুটের একটি তাঁবু টাঙ্গানো দোকানে বসে আমরা চা খেলাম। অটো এবার আবার শহরের ব্যস্ত রাস্তায় ঢুকে চলল আমাদের শেষ দর্শনীয় স্থান, রাম ঘাট। শহরের মধ্যেই খাটাল আছে। রাস্তায় রাস্তায় প্রচুর গরু ঘুরে বেড়াচ্ছে। বারাণসীর রাস্তায় অনেক ষাঁড় ঘোরার বদনাম শুনেছি; সেখানেও এত গোরু ঘুরতে দেখিনি। রামঘাটে নেমে দেখলাম , গোরুর সংখ্যা আরও বেশি। ওখানেও গরুকে খাওয়ানোর জন্য ঘাসের আর্টি বিক্রী হচ্ছে। আমরাও একটি বিরাট চেহারার গরুকে ঘাস খাওয়ালাম। রাম ঘাটে সন্ধ্যায় আরতী হয়। শিপ্রার দুই পার বাঁধানো, যতদূর চোখ যায়। জলে বেশ কিছু মেশিনে চালানো নৌকা চলছে। অনেক লোক ঘাটে স্নান করছে। জলের কাছে গিয়ে, অসম্ভব নোংরা জল দেখে , জলে হাত দিতেও ইচ্ছা হল না। জলের রং দেখে মনে হচ্ছিল, দুই পারে প্রচুর খাটাল আছে। খাটালের গোবর গোলা জল নদীতে এসে মিশে জলের রং সেই রকম করেছে।



রাম ঘাট

বাঁধানো পারের রাস্তা ধরে আমরা হাঁটতে থাকলাম। ঘাটের উপর পর পর অনেক পাণ্ডার অফিস, বোর্ড ব্যানার দেখতে দেখতে চললাম। অনেক পান্ডা, বাঁধানো ঘাটে বসে লোকজনকে পূজা পাঠ করাচ্ছে।



তিন চার জায়গায় লোককে জিঞ্জেস করতে করতে আমরা একটি বড় রাস্তায় উঠে এলাম। ওখান থেকে মহাকাল মন্দিরে নিয়ে যাওয়ার জন্য অনেক টোটো, ডাকাডাকি করছিল। আমরা ঐ রাস্তা ধরে আরও প্রায় আটশ মিটার হেঁটে, বাম দিকে করিডোরে ঢোকান গেটে পেলাম।



এখনও টিকিট কাটতে হচ্ছে না; ভবিষ্যতে টিকিট কাটতে হবে , মনে হল। লাল পাথরে বাঁধানো খুব সুন্দর করিডোর দিয়ে হেঁটে মহাকাল মন্দিরের দিকে এগোলাম। পাশে লাগানো বড় বড় ফুলের গাছ, বেশ যত্ন করে রাখা। অনেক পৌরাণিক কাহিনীর মূর্তি বানিয়ে করিডোরের পাশে পাশে সাজানো। সমুদ্র মন্ডন, রাবণের কৈলাশ পর্বত বয়ে নিয়ে চলা, মহাদেবের মূর্তি ঘিরে সপ্তর্ষি এই সব। রাত্রে আলোর নিচে দেখলে এই করিডোর আরও সুন্দর দেখাবে নিশ্চয়ই।



সপ্তমী

একটা জায়গায় এসে আমরা করিডোর ছেড়ে বাজারের মতো বসে যাওয়া ডালার দোকানের দিকে চললাম। সকালে যেখানে প্রাতরাশ করেছিলাম, সেই রকম আর একটা দোকানে চুকে দুপুরের খাওয়া সেরে নিলাম। তারপর সেই চৌরাস্তার মোড় থেকে টোটো ধরে স্টেশনে ফিরে এলাম। কালিদাসের সেই উজ্জয়িনী কেমন ছিল জানিনা। এখন একটা অতি সাধারণ জেলা শহরের থেকে আলাদা কিছু নয়। রাম ঘাটের উল্টো দিকের পারে বিরাট বড় বড় করে লেখা, “ত্রিভুবন বন্দিতা শিপ্রা!” সেই শিপ্রার জল এত নোংরা যে আমি লিখে বোঝাতে পারলাম না। সন্ধ্যার ট্রেন ধরে ইন্দোর চললাম; ১৮ ই ডিসেম্বর ২০২৪ সালে। ২১.১২. ২৪.

শৈব তীর্থে ভ্রমণ ৩

উজ্জয়িনী থেকে ইন্দোর মাত্র ঘণ্টা দেড়েক। তাই অনেকদিন পর স্লিপার ক্লাসের দুটি ব্যার্থ রিজার্ভ করেছিলাম। সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ ছিল ট্রেনের সময়। মিনিট দশেক দেৱী করে এল। ট্রেনে উঠেই দেখলাম, প্রায় সবাই উজ্জয়িনীতে নেমে গেছে। মাত্র কয়েকজন যাত্রী ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে। আমাদের যে দুটি সিটে বসার কথা, তার একটিতে একজন বছর তিরিশের ছেলে বসে আছে। দুই পা জুতো সহ সিটের উপর তুলে বসেছে। আজকাল আর এসব দেখলেও না দেখার ভান করি। একে ভদ্র ভাবেই বললাম, জুতো খুলে পা তুলে বসতে। ছেলেটি সাথে সাথেই পা নামিয়ে বসল। এক মিনিট পর উঠে গিয়ে ওর বন্ধুকে বোধহয় বলেছে, কোথা থেকে একটা উজবুক বুড়ো এসেছে, জুতো খুলে পা তুলতে বলছে। ওর বন্ধুটা “ দর্শনীয়” লোকটিকে দেখতে এল। আমাকে এসে জিজ্ঞেস করল, কোথায় থাকি? আমি মুহূর্তের মধ্যে বুঝলাম ওর কোন অসৎ উদ্দেশ্য আছে; বললাম, উজ্জাইন। ও আর কিছু না বলে চলে গেল। আমার স্ত্রী বেশ ভয় পেয়ে গেল। আমাকে আস্তে সাবধান করল। আমি সেরকম ভয় না পেলেও, ওরা আরও পিছনে লাগলে কি করতে পারি ভাবতে থাকলাম। আমার মনে পড়ল, বছর দশ বারো আগে, আমি জেলার শহর থেকে স্লিপার ক্লাশে ফিরছি জেনে, আমার এক বন্ধুপত্নী আমার সাথে যোগাযোগ বন্ধ করে দিয়েছে। এখন বুঝতে পারছি, তিনি আমাকে শুধু “ ভিত্তারী” থেকে গেছি ভাবেননি; হয়তো আরও নীচ কোন শ্রেণীর লোক ভেবে নিয়েছিলেন। প্রত্যেক মানুষ নিজের অভিজ্ঞতা দিয়েই অন্যকে বিচার করে। উনিও হয়তো, তারও আগে, স্লিপার ক্লাশে চাপার এই সব অসভ্যতা দেখে নিয়েছিলেন। ইন্দোর স্টেশনে নেমে একটু বিব্রান্ত হলাম। এক পুলিশকে পেয়ে জানতে চাইলাম, Retiring room কোন দিকে? সে বলল, ওটা এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে, বাইরে বেরিয়ে যেতে হবে। সে আবার কি খবর? রেলের ক্লাই ওভারে উঠে সবার পিছন পিছন চললাম। এক অটো রিক্সা চালক উপরে উঠে এসেছে, যাত্রী ধরতে। এক নম্বরে যাব শুনে বলল, অটো নিয়ে যেতে হবে, একশ টাকা ভাড়া। একই স্টেশনের ছয় থেকে এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে যেতে একশ টাকা ভাড়া? কেমন সন্দেহ হল। নিচে নেমে গেলাম। বেশ কয়েকজন অটো চালক এসে ডাকাডাকি করছিল। একজন ষাট টাকায় রাজী হলে তার অটোতে উঠলাম। আমাদের তেমন বড় বোঝা থাকে না। দুটি ছোট ট্রলি ব্যাগ। অটো, মিনিট তিন চার চলেই এক নম্বরের বাইরে পৌঁছে দিল। পরে আমরা ২১ তারিক সকালে হাঁটতে বেড়িয়ে দেখেছি, এক নম্বর থেকে ছয় নম্বরে যাওয়ার সুন্দর করিডোর আছে। মসুন টাইলস বাঁধানো রাস্তা, সাত -আটশ মিটার মত হবে। আমাদের যে ছেলেটি অটো করে এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে পৌঁছে দিয়েছিল, তাকেই জিজ্ঞেস করলাম, সরাসরি বাজার নিয়ে যাবে কি না। সে বলল যাবে, একশ টাকা ভাড়া। আমরা ওকে আধ ঘণ্টা পর আসতে বললাম। ও যেহেতু ঐ জায়গার নয়, তাই বাইরে থাকবে বলল। ফোন নম্বর দিয়ে চলে গেল। আমরা ঠিক সাড়ে আটটায় নীচে নেমে ওকে ফোন করলাম। বার দুই তিন ফোনাফুনি চলল। সম্ভবত ও এর মধ্যে অন্য যাত্রী নিয়ে অন্য দিকে চলে গেছে। আমরা যে মিনিট কুড়ি দাঁড়িয়ে থাকলাম সেই সময়, অন্তত গোটা পাঁচেক অটো আর একটি টোটো ( ওদিকে সবাই বলে , ই-রিক্সা) আমাদের সামনে থেমে, জানতে চাইল, কোথায় যাব? আমরা সকলকেই, গাড়ী আসছে বলে , চলে যেতে বললাম। ই-রিক্সা নিয়ে এসেছিলেন একজন শাড়ী পরিহিতা মহিলা, সাথে বোধহয় তাঁর কন্যা। ওরা আশি টাকায় নিয়ে যাবে, বলেছিল। ঠিক সেই সময় আমাদের সেই ছেলেটি অটো নিয়ে এসে গেল। স্টেশন থেকে সরাসরি

বাজার মিনিট দশ বারো লাগল। একটা গলির মুখে দাঁড়িয়ে, বাম দিকে দেখাল। একটি দোকানে উজ্জ্বল আলো দেখিয়ে বলল, ঐ জায়গা থেকে ডান দিকে চলে যান। সেই ডান দিকে ঘুরেই দেখতে পেলাম, সরু গলির দুই পাশে সারি সারি দোকানের আলো। এই সরু বাজারের খবর জেনেছি, অনিন্দ্য বাবুর ইউ টিউব ভিডিও দেখে। তাই গোটা গলিটাই যেন আমার চেনা। এই সরু বাজার ইন্দোরের একটি দর্শনীয় স্থান। আসল দোকানগুলি সব সোনার গয়নার। রাত সাড়ে আটটার পর, ঐ সোনার দোকান সব বন্ধ হলে, রাস্তার দুই পাশে লাইন দিয়ে দোকান বসে যায়; সবই যাকে বলে, ফাষ্ট ফুড এর। আমরা গোটা গলিটা হেঁটে ঘুরে দেখলাম, বেশ কিছু পানের দোকান, কুলপি আইস ক্রিম, মিষ্টির দোকানও বেশ কিছু আছে। এছাড়া এখন কিছু চাবির রিং ইত্যাদি মেমেন্টোর দোকানও বসেছে। আমরা মূলত দেখার জন্যই ওখানে গেছলাম। তবুও কিছুতো খেতেই হয়। আমরা কিছু খাদ্য কিছু কিছু খেয়ে দেখলাম; সাধারণত যেগুলি কলকাতায় দেখা যায় না। প্রথমেই খেলাম, ডাবের স্পেশাল লসি, বা ঘোল বলা যায়। ডাবের জল আর শাঁস মিশ্রিতে বেশ করে ঘুলিয়ে নেওয়া হয়। একটা সাদা লসি মত তৈরী হয়। ডাবের জল আর শাঁস দুই এর স্বাদ পাওয়া যায়।



ডাবের লসি

কুলপি বলল, পঞ্চাশ টাকা থেকে ছয়শ টাকা দামেরও আছে। কুলপি কিন্তু আধুনিক ডিপ ফ্রিজে রাখা। আসল আকর্ষণ কিন্তু বিক্রেতা। দুজন একই রকম চেহারা, একই পোশাক, আর কয়েক কেজি সোনালী গয়না পরে কুলপি বিক্রী করছে। ওদের সাথে ছবি তোলায় জন্যই লোকে কুলপি কিনছে। আমরাও কিনলাম, ছবি তোলা হল। সেই ছবি দেখে দীনবন্ধুবাবু মন্তব্য করেছেন, “আপনি তো সোনার খনিতে পৌঁছে গেছেন!” আজকাল প্রতিদিনই কিছু লোক ঐ বাজারে ছবি তুলে বা ভিডিও করে ইউ টিউব-এ দেয়; তাতে এদের বেশ প্রচারও হয়ে যায়। অনেক কটা দোকানে ব্যানার ফেস্টুন দেখলাম, লিখেছে, “ইউ টিউব খ্যাত!” ঠিকই, আমিও তো ঐ ইউ টিউব দেখেই এই বাজারের খবর জেনেছি। একটি বেশ ছড়ানো মিষ্টির দোকানে, আতার পায়েস দেখে, এক বাটি কিনে, দুজনে খেলাম। এই “আতার পায়েসের” কথা বেশ কিছু বছর আগে, টেনিদার গল্পে পড়েছি। সেটা ছিল, দেওঘরের বিখ্যাত “আতার পায়েস!” এরা অবশ্য পায়েস বলেছিল না; হিন্দিতে অন্য কোনো নাম বলেছিল (সিতাফল রাবড়ী)।





রাহুল আমাদের নিয়ে চলল, লালবাগ প্যালেস। একটা ছোট খাট ময়দানের ভেতর দিয়ে রাস্তা। মাঠে ছেলেরা খেলছে। রাস্তা ধরে দলে দলে মানুষ প্রাতঃভ্রমণ করতে চলেছে। অনেকেই জোরে জোরে হাততালি দিয়ে “জয় মহাকাল” বলে বলে হাঁটছে। কিন্তু প্যালেসের দরজা তখনও খোলেনি, বোধহয় দশটার পর খোলে। আমাদের মত আরও কিছু ট্যুরিস্ট গেট বন্ধ দেখে ফিরে চলল। গেটের উল্টো দিকে গোটা তিনেক বিশাল তেঁতুল গাছের ডালে ডালে ঝুলছে, শত শত বাদুড়; ছবি তুলে অটোতে উঠলাম।



এরপর অন্নপূর্ণা মন্দির। বেশ চকচকে সাদা মার্বেল পাথরের মন্দির। দুই চার জন করে দর্শনার্থী ঘুরে যাচ্ছে; আমরাও দর্শন করে নিলাম। ঐ মন্দির চত্বরে আরও গোটা তিনেক মন্দির দেখে, এক জায়গায় মশলা চা বিক্রী করছে দেখে দাঁড়ালাম। ছোট কাগজের কাপে চা খেয়ে দেখতে দিল। চায়ের কিছু নেই, আদা, গোলমরিচ গুঁড়ো ইত্যাদির পাঁচন। ঠাণ্ডা লেগে গলা খুশ খুশ করলে ভালো লাগবে; তাই আমিও একটা প্যাকেট কিনে নিলাম। শহরের মধ্যেই, একটু শুরু রাস্তার উপর কাঁচ মন্দির। আমরা নেমে ঢুকতে গেলে, গেটে দাঁড়িয়ে এক বয়স্ক মানুষ

বললেন, সাড়ে দশটায় খুলবে। এখন শুধু জৈন ধর্মের লোকেরা পূজা দিতে ঢুকতে পারে। ওখান থেকে সামনেই রাজায়ারা প্যালেস। বাইরে থেকে গেট দেখে বোঝার উপায় নেই। এটাও মহারানী “দেবী অহল্যাবাই” এর একটি বাড়ী। পুরোনো কাঠের খামগুলি সমীহ জাগায়।



দোতলার মিউজিয়াম দেখার জন্য পনের টাকার টিকিট কেটে ভেতরে ঢুকলাম। আমরা দোতলায় ওঠার পর কর্মচারীরা আলো জ্বালিয়ে দিল। ওদিকে আসলে কোলকাতার থেকে প্রায় চল্লিশ- পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর সূর্য ওঠে; তাই সবই মনে হয় দেবী করে খুলছে। আমরা এগারোটোর মধ্যে সব ঘুরে নিয়েছি। বাকী রইল শুধু “রিজিওনাল পার্ক।” আমাদের সুচিতে না থাকলেও, সময় আছে বলেই চললাম দেখতে। এটি শহরের ভেতর একটি সাজানো গোছানো বিরাট পার্ক। অনেক বড় বড় গাছ আছে। ভেতরের রাস্তা ঝকঝকে টাইলস বাঁধানো। ফুল গাছ প্রায় নেই। প্রায় আধা কিমি ভেতর ঢুকলে একটি বিশাল ঝিল আছে। বোটিং হয়, আমাদের খোঁজ নেওয়ার সময় ছিল না। ঝিলে বেশ কিছু বড় বড় হাঁস ভাসতে দেখে ছবি তোলা হল। ওগুলি পোষা হাঁস কি না বুঝলাম না। পঁচিশ টাকার টিকিট কেটে ঢোকান মত পার্ক নয়।



রাহুল আমাদের স্টেশনের কাছে একটি ভালো থাওয়ার রেস্টুরেন্টে নামিয়ে রেখে চলে গেল। আমাদের থাওয়া হলে, রাতের জন্য চারটি তাওয়া রুটি বেঁধে নিলাম। ফোন করতেই রাহুল এসে আমাদের স্টেশনে পৌঁছে দিল। ভালো ছেলে ( মোবাইল নং- ৮৬২৯৯০০৬২৫)। আমার কাছে বেশী টাকা ক্যাশ ছিল না, UPI তে ওর পাঁচশ টাকা দিয়ে দিলাম। ওদিকে UPI খুব চলে; তিরিশ টাকা, চল্লিশ টাকাতো অনেকবার দিয়েছি। আমাদের ট্রেনের নাম Indore Prayagraj Express হলেও, ওটা ছেড়ে আসে, একুশ কিমি আগের , ডাঃ আশ্বদকর নগর স্টেশন থেকে। পৌনে বারোটোর ট্রেন, মিনিট দশেক দেরী করে এল। পরদিন ভোরে মিনিট দশেক আগেই প্রয়াগরাজ স্টেশনে পৌঁছে গেল। আবার আর এক তীর্থে পৌঁছে গেলাম। চার মাস আগে টিকিট কাটার সময় জানতামই না যে, আমরা পৌঁছানোর দিন দশেক আগেই, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ওখানে মহাকুস্ত মেলার উদ্বোধন করবেন। কপালে পূণ্য থাকলে না নিয়ে যাবো কোথায়? বলব সে সব গল্প। তার আগে অন্য তিন জায়গার কথা বলে নিতে হবে। ২৩.১২.২৪.

আজ সকাল সকাল বাড়ী ফিরে এলাম। বাকী কথা এদিকে বসেই লিখতে হবে। আজ শুরু করলাম, মাদুরাই এর দিকের হোটেল এর খোঁজ খবর।

#### শৈব তীর্থে 4

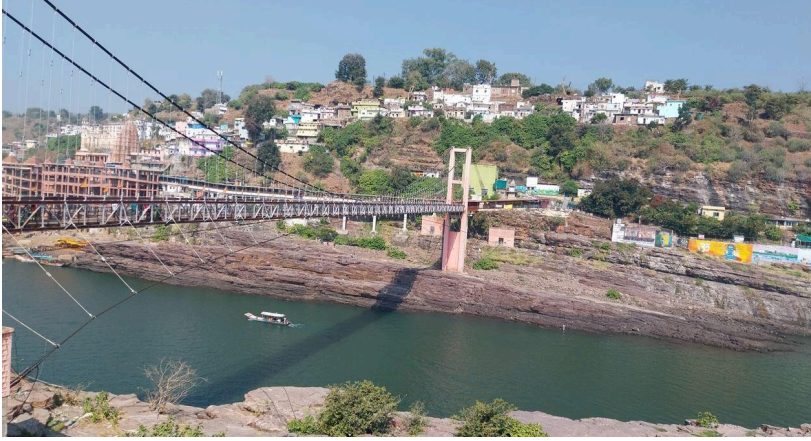
ইন্দোরের একটি সংস্থার গাড়ি আমাদের ওঙ্কারেশ্বর নিয়ে যাবে, এক রাত ওখানে থেকে পরদিন বিকেলে ফিরে আসার কথা। রাত্রেই ড্রাইভার এর নম্বরে ফোন করে বলে দিলাম, সকাল আটটায় বেরিয়ে যাব। কিন্তু স্টেশনের এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে Retiring room এ থাকছি, ব্যাপারটা বোঝাতে সময় লাগল। ওরা হোটেল বোঝে, Retiring room ব্যাপারটা ঠিক বোঝে না। যাই হোক, ড্রাইভার সকালে আটটার পাঁচ মিনিট আগেই ফোন করে জানাল, এসে গেছে। আমাদের এই গাড়ী নিয়ে বেরোনো, এই যাত্রায় এটিই প্রথম। যে কোন ভ্রমণে সবথেকে বেশি খরচ হয় গাড়ীর পিছনে। এবার তো আমরা হোটেলও মাত্র এক রাতের জন্য নিয়েছি। এবারের গাড়ীর এই সংস্থার মালিকের সাথে আমার দেখা হয়নি। সবই Whats App আর ফোনে কথা বলে ঠিক করা।( Indore Car, Javed : 6262026262) এই গাড়ীর যাত্রায় আমরা বার তিন চার নতুন করে প্রোগ্রাম ঠিক করেছি। আমার অত্যন্ত প্রিয় মানুষ, সদ্য অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক, শিক্ষা রত্ন, শ্রী সুরত কুমার বুড়াই কদিন আগেই জেনেছেন যে আমি ইন্দোর যাচ্ছি। ওনার প্রিয় ছাত্র, ডক্টর নরেন্দ্রনাথ এখন ইন্দোরের IIT তে অধ্যাপক। বুড়াই বাবুর খুবই ইচ্ছা, আমরা যেন তাঁর প্রিয় নরেন্দ্রনাথের বাড়ীতে গিয়ে থাকি। আমাদের ঠাসা প্রোগ্রামে সেটা সম্ভব নয়, অনেক কষ্টে বোঝাতে পেরেছি। কিন্তু যেমন শিক্ষক, তেমনি তাঁর ছাত্র। আমি উজ্জয়িনী পৌঁছনো থেকেই ডক্টর পাত্র আমার খোঁজ খবর নিতে শুরু করেছেন। ওনার কেনা নতুন বাড়ী আমাদের রাস্তা থেকে একটু ভেতরে হলেও, Indore IIT আমাদের যাত্রা পথের পাশেই। তাই অন্তত IIT তে ঢুকে ওনার ওখানে Breakfast করে যেতে বললেন। আমরা গাড়ীতে উঠে ড্রাইভারকে সেই মত জানালাম। ড্রাইভার শুধু বলল, বেশী দেরী করবেন না, রাস্তা খারাপ, সময় লাগবে। রাস্তার অনেক জায়গায় নতুন ক্লাইওভার তৈরী হচ্ছে, তাই খুব স্বচ্ছন্দে যাওয়া যাচ্ছিল না। তবুও আমরাই আগে IIT এর গেটে পৌঁছে গেলাম। ডক্টর পাত্র ওনার এক ছাত্রকে ফোনে বলে দিলেন, আমাদের সাথে দেখা করে, ক্যান্টিনে নিয়ে যেতে। গেটের গার্ডকে আমার ফোনেই ডক্টর পাত্র বলে দিলেন।



With Dr Patra at IIT Indore

সুন্দর সাজানো বিরাট ক্যাম্পাস এর ভেতরে ঢুকে, গাড়ী একেবারে সেন্ট্রাল ক্যান্টিন এর সামনে দাঁড়াল। ছাত্রটি এসে আমাদের ক্যান্টিনে নিয়ে গিয়ে, খেয়ে নিতে বলল। আমি আগে গোটা দুই IIT এর ক্যান্টিন, অতিথি ভবন ইত্যাদিতে খেয়েছি। এদের বিশাল তিন তলা জুড়ে ক্যান্টিন। এক এক তলায় হাজার খানেক লোকের বসার ব্যবস্থা। আমরা খাওয়ার পর ওদের গবেষণাগারের দিকে এগিয়ে গেলাম। এই ছাত্রটি এখন ডক্টর পাত্রর কাছে, PHD করছে; মুম্বাই এর ছেলে। আমার ছেলে মেয়ের থেকেও অনেক ছোট। আমার আবার মুম্বাই এর লোকেদের উপর একটা দুর্বলতা আছে। আমার ভীষণ বিপদের সময় মুম্বাই এর লোকেদের কাছে যা সাহায্য পেয়েছি, সারা জীবন ওদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকব। এদের গবেষণার বিষয় Astro Physics! ডক্টর পাত্র এই বিষয়ের এক বিশাল পণ্ডিত। কিন্তু মানুষটি একেবারেই মাটির মানুষ। ওনার টেবিলে, স্বামী বিবেকানন্দ লিখিত রাজযোগ বইটি দেখলাম। উনি পড়ছেন। ওনার গবেষণাগারে মিনিট পনের কুড়ি থাকলাম। যে কোন অতি বিখ্যাত মন্দিরের গর্ভ গৃহে থাকার থেকে অনেক বেশী গর্বের ব্যাপার আমার কাছে। ওনারা যে সকল বিষয় নিয়ে গবেষণা করছেন, আমাদের মত বারো ক্লাশ পর্যন্ত ফিজিক্স পড়া লোকের কাছে সেটা 'টিভিতে প্রশান্ত মহাসাগরের ছবি দেখার মত!' যে সকল দু'দিনের বৈরাগী এখন ভাতকে বলে অল্প, তারা আবার ঐ রাজযোগ পড়া নিয়ে কোন " আনন্দবাজারী" মন্তব্য করেন কে জানে! ডক্টর পাত্রই বললেন, এদিকে এসেছেন যখন, মহেশ্বরও পারলে ঘুরে যান। আমরা ওনার বাড়ীতে ফেরার পথে ঢুকতে পারি, এরকম বলে , ওঙ্কারেশ্বর -এর দিকে রওনা দিলাম। মহাকাশ, মহাবিশ্ব নিয়ে যেটুকু আভাস ডক্টর পাত্র আমাদের দিয়েছেন, তাই নিয়ে চিন্তা করার সামর্থ আমার নেই। ও নিয়ে আমাকে কিছু লিখতে বলবেন না। আমি আদার ব্যাপারী, জাহাজের ছবি দেখেছি, মহা সমুদ্র নিয়ে কিছু লিখতে পারব না।

এবার দিন সাতকের যাত্রায় আমি একবারই অসুস্থ হয়ে পড়েছি, মাত্র আধ ঘণ্টার জন্য। অনেকদিন পরে গাড়ীতে মোশন সিকনেস হল। হঠাৎ গা গুলিয়ে বমি পেল। ড্রাইভার গাড়ী থামাতে থামাতে কোন রকমে জানালার কাঁচ নামিয়ে বমি করলাম। নেমে চোখে মুখে জল দিয়ে আবার চললাম। মিনিট পনের কুড়ির মধ্যে পৌঁছে গেলাম, ওমকারেশ্বর। বড় রাস্তা থেকে নদীর দিকে যাওয়ার রাস্তায় গাড়ী ঢুকতে দিচ্ছে না। হোটেলে ফোন করার পর, হোটেলের ম্যানেজার এসে ট্রাফিক পুলিশকে বোঝাল যে, ওর হোটেলে গাড়ী পার্কিং এর ব্যবস্থা আছে; তারপর গাড়ী ঢুকল সেই সরু রাস্তায়। সত্যিই বেশ সরু রাস্তা; বড় অটো দুটি যাতায়াত করতে পারে। তাতেই জট পাকিয়ে ফেলেছে। অটো চলার রাস্তা ছেড়ে বাঁ দিকে ঢুকলাম। এটা যে মন্দিরের দিকে যাওয়ার রাস্তা সেটা দুই পাশের দোকানপাট দেখলেই বেশ বোঝা যায়। ঐ রাস্তা ধরেই “ঝুলা পুল” আর সোজা অমলেশ্বর মন্দির যেতে হবে। আমাদের হোটেল, “ গুরুকৃপা ইন” , ঝুলা পুলে ওঠার ঠিক আগেই, ডান দিকে, একটু নদীর দিকে নেমে। গাড়ী আমাদের নামিয়ে, আরও নীচে নেমে গেল, হোটেলের পার্কিংয়ে। আমাদের হোটেলটি বেশ ভালো জায়গায়। পিছনের জানালা দিয়ে নর্মদা নদী দেখা যায়। একটু বাম দিকে তাকালে ঝুলা পুল, আর তার ওদিকে ওঙ্কারেশ্বর মন্দির দেখা যায়।



সন্ধ্যার পর পুল, মন্দির, ওপারের গোটা দ্বীপ আলোয় আলোয় সাজানো।



একটিই সমস্যা; সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার আগে পর্যন্ত নদীতে মেশিন লাগানো নৌকা চলতেই থাকে; সারাদিন ঘরঘর শব্দ। আমরা হোটেলে ব্যাগ পত্র রেখে, এক কাপ চা খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম। ঝুলা পুল পেরিয়ে মন্দিরের দিকে চলার সময়, অসংখ্য মহিলারা পূজার ডালা কিনে নিয়ে যেতে সাধাসাধি করতে থাকল। আর আছে, ফটো তুলে, সাথে সাথেই প্রিন্ট করে দেওয়ার চার-পাঁচ জন লোক। আমরা ফেরার রাস্তা ধরা, কপালে টিপ দেওয়া দু-একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, মন্দিরে ভিড় কেমন? কেউ কেউ বলল, মন্দির এখন বন্ধ, তিনটায় খুলবে। বেড়ার মধ্যে ঢুকে দেখলাম, লাইন ফাঁকা। ওদিকের ডালার দোকানের লোকেরা বলল, একটা দশের পর আবার খুলবে। আমরা একটা ডালা কিনে, জুতো জমা রেখে, বেড়ার মধ্যে ঢুকে গেলাম। বেশ কিছুটা এগিয়ে দেখি এর মধ্যে লাইন পড়ে গেছে। মনে ভাবলাম, একটা তো বাজেই, না হয় এক ঘন্টা লাইন দিলাম। বিখ্যাত মন্দিরের লাইন ঠিক কি বস্তু, এখানেই ঠিক বুঝলাম। ১৯ শ ডিসেম্বর, আমি তো শুধুই একটা গরম জামা গায়ে বেড়িয়েছি। লাইনে অনেক ফ্যান চলছে; তবুও কয়েকজন গরমে অস্থির হয়ে বসেই পড়ল। গুতাগুটি করে লাইন এগিয়ে চলল অতি ধীর গতিতে। শেষ একশ মিটার যেতে দুই ঘন্টা লাগল। অনেক আগেই দেখেছি, পাশের বেড়াটি ভিআইপি লাইন।



Lt line is VIP, Rt one general

ততক্ষণে আমাদেরও পিছনে কয়েকশ লোক দাঁড়িয়ে আছে; পিছন ফিরে বেরোতেই হয়তো এক ঘন্টা লাগবে। তার মধ্যেও দুই একজন মহিলা লাইন ভেঙ্গে, গুতিয়ে এগিয়ে যেতে চাইছে, ঝগড়া লেগে যাচ্ছে। শেষ কুড়ি ফুট বাকি থাকতে দেখলাম, অন্য দিক থেকে আরও দুটি লাইন এক জায়গায় এনে মিলিয়ে দিয়েছে। অতি সংকীর্ণ জায়গায় এক বিশ্রী গুতাগুতি কান্ড। শেষ দশ ফুট আগে, বাম দিকের থেকে ভিআইপি লাইনও এই হট্টগোলে মিশেছে। এখানেও শিব লিঙ্গের সামনে এক দেড় সেকেন্ড দাঁড়ানোর ব্যবস্থা। দাঁড়িয়ে গেলে পায়ের তলায় পড়ার সম্ভাবনা। এখানে শিব লিঙ্গের দু'ফুট দূরে কাঁচ দিয়ে ঘেরা; তার বাইরে দিয়ে দর্শন করে নিতে হবে। এই শিব লিঙ্গের উচ্চতা সাত আট ইঞ্চি হবে সম্ভবত। আমাদের হোটেলে ফিরতে প্রায় সাড়ে তিনটা বাজল। পূজার প্রসাদ হোটেলে রেখে, খেতে বেরোলাম। মন্দিরে ঘন্টা আড়াই লড়াই করে একটি উপকার হয়েছে; আমার সেই গা গোলানো ভাব কেটে গিয়ে বেশ খিদে পেয়ে গেল। হোটেলে ফিরে এক ঘন্টা বিশ্রাম নিয়ে আবার বের হলাম। সেই অটোর জটলায় পৌঁছে খোঁজ খবর নিলাম, আদি শঙ্কর এর মূর্তি দেখতে কত টাকা ভাড়া, কত সময় লাগবে, এসব।



বুঝলাম, সকালে যাওয়াই ভালো। নৌকার মাঝিও লোক ধরতে দাঁড়িয়ে আছে। শুনলাম ভাড়া; মাথা পিছু তিনশ টাকা। নিচে ঘাটের কাছে যেতেই অন্য নৌকার মাঝিরা প্রায় টানাটানি করে, একটি পাঁচ ছয় জনের দলের সাথে আমাদের দু' জনকেও তুলে নিল। আমাদের ভাড়া মাথা পিছু একশ' টাকা। আগে যারা উঠেছে তাদের কত করে নিয়েছে, আমরা জানি না। শুধু আমাকে আস্তে করে বলল, তোমরা কত ভাড়া দিচ্ছ ওদের বোলো না। বেড়ানোর জায়গায় এসব চলতেই থাকে। যার কাছে যা পারে নিয়ে নেয়। সূর্য ডোবার মুখে নৌকা ছাড়ল। তখনও অন্তত গোটা পনের নৌকা, ঘড়ঘড় শব্দ করে শব্দ দূষণ করে চলেছে। সব মিলে মিনিট পনের কুড়ি নৌকা বিহার। দুই পাড়ে আলো জ্বলে উঠলো। জলে আলোর ছায়া। এর মধ্যে চলল আমাদেরও মোবাইলে ভিডিও তোলা। দলের লোকগুলি নামল ওঙ্কারেশ্বর মন্দিরের ঘাটে। আমাদের কথা মত নামাল উল্টো দিকের, অমলেশ্বর মন্দিরের ঘাটে। এখানে নদী দেড় দু'শ ফুট মাত্র চওড়া। আমরা যেখানে ঘাটে নামতে চাইলাম, সেখানে তখন জোর বাদ্য বাজনা বাজিয়ে আরতি চলছে। প্রতিদিনই হয় কি না, জানিনা। ওদিকে সবই শিব ঠাকুর আর নর্মদা মায়ের পূজা। এরা দেখলাম, হরে কৃষ্ণ হরে রাম গানও করল। এখানে নদী থেকে উপরের মন্দির প্রায় পঞ্চাশ ষাটটি সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হল। এদিকেও ঘাটের থেকে মন্দির পর্যন্ত প্রচুর ডালার দোকান। এই অমলেশ্বর বা মামলেশ্বর মন্দির চব্বরে দুটি প্রায় একই রকম মন্দির; পুরনো পাথরের তৈরি।



সামনে পিছনে অনেকটা খোলা, পাথর বাঁধানো চত্বর আছে। মন্দিরে ঢোকান আগে, পঞ্চাশ ফুট মত, স্টেনলেস স্টিলের বেড়া দিয়ে লাইন করার ব্যবস্থা। সন্ধ্যায় ঐ পঞ্চাশ ফুটের বাইরে পর্যন্ত লাইন। আমরা ঢোকান চেপ্টা করলাম না। আর একটু উপরে উঠে ফেরার রাস্তা ধরলাম। রাস্তার দুই ধারে সাজানো হরেক রকমের দোকান তখন সবই খোলা। আমরা সোজা সেই দুপুরের খাবারের দোকানে গিয়ে, রাতের জন্য রুটি কিনে নিলাম। এদিকে সব জায়গায়ই তন্দুরী রুটি বেশী চলে। তাওয়া রুটি না বললে, ওরা আমাদের মত সাধারণ রুটি বোঝে না। রাত্রে আটটা সাড়ে আটটার পর আর নোকান ঘরঘর শব্দ শুনিনি। ভোরে আমরা উঠেছি সাড়ে পাঁচটা নাগাদ। কিন্তু সূর্য উঠল পৌনে সাতটা নাগাদ। আমরা ছয়টার দিকে যখন সেই বাজারের মধ্যে দিয়ে অমলেশ্বর মন্দিরের দিকে হেঁটে চলেছি, তখন রাস্তা বেশ অন্ধকার। আমরা ঝুলা পুল ছাড়িয়ে একটু এগিয়ে ডান দিকে ঘুরে দেখলাম, একটা ব্রীজের উপর ওঠার রাস্তা। ঐ ব্রীজটা নদী পের হয় না। এদিকেই একটা করিডোর মত করেছে। ওটার উপর থেকে উল্টো পারের মন্দির, ধর্মশালা, ঘরবাড়ির আলোকিত দৃশ্য তো দেখাই যায়, তারও উপরে দেখা যায়, ষাট ফুট উঁচু আদি শঙ্করাচার্যের মূর্তি। আমরা ঐ করিডোর ধরে এগিয়ে, অমলেশ্বর মন্দিরের সামনের রাস্তায় পৌঁছে গেলাম। সেই অন্ধকার থেকেই কিছু কিছু ডালার দোকান বসে গেছে। মন্দির চত্বরে পৌঁছতেই এক পূজারী পান্ডা আমাদের ধরে ফেলল। আমরাই ওর প্রথম শিকার। ভালো শিকারী। একশ একাল্ল টাকা দক্ষিণা নিয়ে পূজা করিয়ে দিতে রাজী হল। বেশ ফাঁকা ফাঁকা মন্দিরে ঢুকে পূজা দিয়ে বেরিয়ে, বাইরের একটি ছোট্ট শিব লিঙ্গের সামনে দুজনকে বসিয়ে, একটু মন্ত্র পাঠ করিয়ে, হরে দরে পাঁচশ দশ টাকা নিয়ে নিল। আসলে আগের দুপুরের তিন ঘন্টার গুতাগুতি মনে ছিল বলেই, এই সুস্থ স্বাভাবিক পূজা দিয়ে ঐ টাকাটা দিতে ইচ্ছাই হল। এই মিনিট দশকেই কিন্তু মন্দিরে ঢোকান লম্বা লাইন শুরু হয়েছে। ঐ পাণ্ডার কাছেই জেনে নিয়ে, পুরাতন ব্রীজের

দিকে চললাম। রাস্তায় একটি বড় বিষ্ণু মন্দির দেখে দাঁড়িয়ে গেলাম। আমাদের আগে মাত্র দুজন যাত্রী। আমার স্ত্রী মন্দিরে উঠে গেলে আমি নিচের চত্বরে ঘুরে দুই একটা ছবি তোলার চেষ্টা করলাম। সেই সময় এক ভদ্রলোক এসে তুলসী মঞ্চের মত বাঁধানো জায়গায় ফুল জল দিচ্ছিলেন। বছর পঞ্চাশ বয়সের প্যান্ট শার্ট পরা ভদ্রলোক। ওনাকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, কোন দিক দিয়ে ব্রীজে যেতে পারব; আর ঐ শঙ্করাচার্য মূর্তির কাছে যাওয়ার রাস্তা কোন দিকে? একেই বলে যোগাযোগ। ভদ্রলোক বললেন, শুধু ঐ মূর্তি দেখে ফিরতে এক ঘন্টাতো লাগবেই, আর কোনোদিন এদিকে আসা হবে কি না, এবারই গোটা দ্বীপ একটা পরিক্রমা করে নাও। ঘন্টা দুই আড়াই লাগবে। শীতের সকালে হাঁটতে কষ্টও হবে না। বলে দিলেন, ব্রীজ পেরিয়ে একটু নামলেই সাত আট ফুট চওড়া পাথর বাঁধানো রাস্তা পেয়ে যাবেন। গাইড লাগবে কি না বলায় একটু বিরক্ত হলেন। বললেন, এখানে সবাই “লুটনে কে লিয়ে” বসে আছে। কিছু লাগবে না, চলে যাও। ওনার কথা মত এগিয়ে সুন্দর পরিক্রমা হল।



এই পরিক্রমার কথা আমি কোন ইউটিউব ভিডিওতে দেখিনি। স্বাভাবিক ভাবেই, সেই সকালে দুপারের মন্দিরে হাজার পাঁচেক লোকের ভিড় থাকলেও, আমরা বোধহয় জন কুড়ি লোককে পরিক্রমা করতে দেখেছি। সেই পাথর বাঁধানো রাস্তা দিয়ে একটু এগিয়ে একটি চায়ের দোকান দেখে বসে চা খেলাম। সেই দোকানের পিছনে তিন দিক আর উপরে ত্রিপল ঘেরা একটি জায়গায়, জন দশ বারো বয়স্ক মানুষ, স্ত্রী পুরুষ মিলিয়ে, পূজা পাঠ করতে বসে গেছেন। দোকানদার বলেছিল, ওরা নর্মদা পরিক্রমায় বেড়িয়েছেন। এরকম দিন দুই তিন থেকে আবার এগিয়ে যাবেন। ওনাদের পূজা পাঠের ছবি তুলে আমরা এগিয়ে চললাম।



পরে এরকম চটি আরও কয়েকটি দেখেছি। সেখানে বেশ বড় একটি করে স্টিলের ট্রাস্ক রাখা আছে। দশ বারো জন পরিক্রমাকারীর বোচকা পুটুলি ঐ ট্রাস্ক এ অনায়াসে ঢুকে যাবে। পাহাড়ের গা বেয়ে চলেছে সেই রাস্তা। প্রায় পুরো সময় নিচে বাঁদিকে নর্মদা নদী দেখা যাচ্ছে। কোথাও কোথাও একশ মিটার রাস্তার পাশে কোন বাড়ী ঘর নেই। মাঝে মাঝে এক একটা ছোট ছোট কুঠিয়া বা আশ্রম। একটি রামকৃষ্ণ কুঠিও দেখলাম।



দ্বীপের দক্ষিণ দিকে পরিক্রমা করে , পশ্চিম প্রান্তের সঙ্গমের উপরে পৌঁছে গেলাম। ওখান থেকে নীচে একটি রাস্তা নেমে গেছে, সঙ্গম পর্যন্ত। আমরা সেই রাস্তা দিয়ে হেটে প্রায় দুশো মিটার গিয়ে, সঙ্গমে পৌঁছলাম।



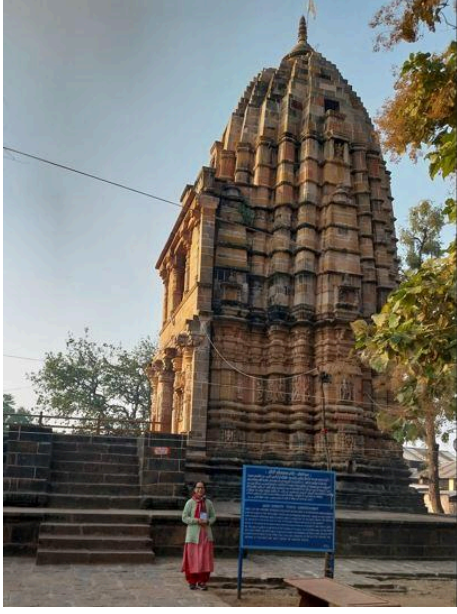
দ্বীপের উত্তর দিক দিয়ে নর্মদা নদীর যে ধারা বয়ে এসেছে, সেটিই বেশী চওড়া। বেশ স্রোত বইছে নদীতে, দেখলেই মন ভালো হয়ে যায়। জল একেবারে ঝকঝকে পরিষ্কার। দেখলে মুখে নিয়ে খাওয়ার ইচ্ছা হবে। তখন দোকানপাট সবে বসছে। আমরা একটি ছোট্ট জ্যারিকেন কিনে, সঙ্গমের জল ভরে নিলাম। আমি একটি একশ গ্রাম মত ওজনের পাথর জলের নীচে থেকে তুলে ব্যাগে ভরে নিলাম। আমার টেবিলে রুদ্র প্রয়াগের দুটি পাথরও আছে।



Smaller one is of Narmada

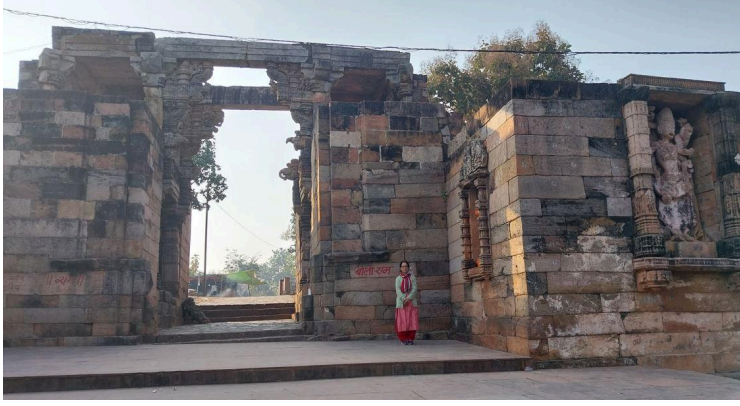
সঙ্গমের কাছে গোটা তিনেক ছোট গাধা দেখে ছবি তুলে নিলাম। এবার আমরা দ্বীপের উত্তর দিক ধরে হাঁটব। উঠে এসে সেই পাথর বাঁধানো পরিক্রমার পথে পড়তেই, ডান দিকে একটু উপরে দেখলাম, ঋণমুক্তেশ্বর শিবের মন্দির। এই মন্দিরের কথাও পড়েছি, শাস্ত্রী মশাই এর বইতে। কিন্তু আমরা এই মন্দিরে ঢুকলাম না। আমার এখন আর কোন জাগতিক ঋণ নেই। যে দুই মহাজনের ঋণ, মানুষ জন্মজন্মান্তর ধরেও শোধ করতে পারে না, সেই বাবা মা তো কবেই চলে গেলেন। সেই “ স্বর্গাদপী গরীয়সী” দেব দেবীর ঋণ শোধ করতে কোন ফাঁকিবাজির আশ্রয় নিতে আমি রাজী নই। পথে চলতে চলতে আমার স্ত্রীকেও সেই কথা বললাম। এই ( সরকারী)

বৃদ্ধ বয়সে এসেও যদি এটুকু সততা না থাকে, তাহলে বৃথাই আমার তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়ানো। এদিকে রাস্তাটা একটু উপরে। প্রায় দ্বীপের মাথার উপর দিয়ে চলেছে। বাম দিকে নদী দেখা যায় না। এখানে রাস্তার পাশে পাশে বেশ কিছু বাড়ী, চটি, মন্দিরও আছে। কয়েকটি বাস্চা পিঠে বইয়ের ব্যাগ নিয়ে স্কুলে চলেছে। ওদের দেখে মনে পড়ল, আমার ছোট্ট ব্যাগে কিছু লজেস আছে। ওদের থামিয়ে কটা কথা বলে, জানতে চাইলাম, ছোট লজেস নেবে কি না। গোটা পাঁচ ছয় লজেস বের করে ওদের দিলাম। ক্লাশ শিক্বে পড়া ছেলেটি লজেস নিয়ে, আস্তে করে বলল, “নর্মদে হর!” আমার স্ত্রী বুঝতে পারেনি ছেলেটি কি বলল। আমি বুঝেই বললাম, “হর নর্মদে।” এটা আমি শাস্ত্রী মশাই এর বই পড়ে জেনেছি। উপরের ঐ রাস্তার পাশে কিছু গ্রামের মত বাড়ী ঘর দেখলাম। সবকটা মন্দিরে ঢোকান সময় ছিলনা।



Gouri Somnath Temple

হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছে গেলাম, সেই ষাট ফুট উঁচু আদি শঙ্কর মহারাজের মূর্তির কাছে। ওখান পর্যন্ত পাকা রাস্তা আছে। এই রাস্তা নীচে PWD অফিসের দিক থেকে উঠেছে, দেখে এসেছি। কয়েকটি ছবি তুলে নিলাম। মূর্তির সামনে, পাহাড় কেটে সমতল মাঠের মত করা হয়েছে। এখনও কোন দোকান পাট বসেনি। ওখানেই দেখা হল বেশ বৃদ্ধ এক সাধুর সাথে। লাঠি হাতে ঘুরছিলেন। (পরে মনে হল, আচ্ছা, উনি রঞ্জন মহারাজ নয় তো!) ওনাকে জিজ্ঞেস করে পরিক্রমার রাস্তা জেনে নিলাম। ওখানে পাহাড় কেটে মাঠ তৈরীর জন্য বাঁধানো রাস্তা হারিয়ে গেছে। দ্বীপের উত্তর ঢালে কিন্তু এখনও কিছুটা জঙ্গলের মত থেকে গেছে। বেশ বোঝা যায় শাস্ত্রী মশাই সত্তর বছর আগে এখানে যে বনের মধ্যে তপোবন এর কথা লিখেছেন, সবই সম্ভব। মাঝে মাঝে কিছু পাথরের তৈরি গেটের ভেতর দিয়ে পরিক্রমার রাস্তা চলেছে।



আমরা একটি দোকানের সামনের বেঞ্চে বসে চা খেলাম। ঐ দোকানে ডিপ ফ্রিজে চকলেট, আইসক্রিম রাখা হয়েছে। একটা জায়গায় প্রায় একশ সিঁড়ি বেয়ে নামতে হল, তারপর আবার একশ সিঁড়ি উঠতে হল।



শেষ এক জায়গায় এসে, পঞ্চাশ সিঁড়ি নেমে, পাহাড়ের গায়ে তৈরী একটা দেড়শ মিটার মত সিমেন্টের করিডোর ধরে এগিয়ে ওঙ্কারেশ্বর মন্দিরের কাছে বুলাপুল এর অন্য পারে পৌঁছে গেলাম।



Hanging bridge from other side

হোটলে ফিরে স্নান করেই আমাদের বেরনোর কথা। সাড়ে নয়টার হোটলে ঢুকে দেখি লোড শেডিং চলছে। ফ্রন্ট ডেস্ক এ বলতে, ইনভার্টার চালু করলো। কিন্তু গিজার আর চলল না। একবার ভাবলাম, নর্মদায় স্নান করতে চলে যাই। শেষে ঠাণ্ডা জলে স্নান করেই রওনা দিতে হল। এবার আমাদের গন্তব্য মহেশ্বর। ঘন্টা দুই আড়াই লাগবে গাড়ীতে। ফাঁকা মাঠের ভিতর দিয়ে ছুটল গাড়ি। দুই পাশে বিস্তীর্ণ সবুজ মাঠ। গম আর ছোলার চাষ হয়েছে। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ছোলা ক্ষেতের ছবি তোলা হল। ২৫.১২.২৪.

- পরিক্রমা পথের পাশে বেশ প্রাচীন মন্দিরের অবশেষ কিছু এখনও আছে। এই দ্বীপ পরিক্রমা না করলে, ওমকারেশ্বর ভ্রমণ এর কোন মানে নেই।



দ্বীপে জঙ্গল



Steps down towards corridor

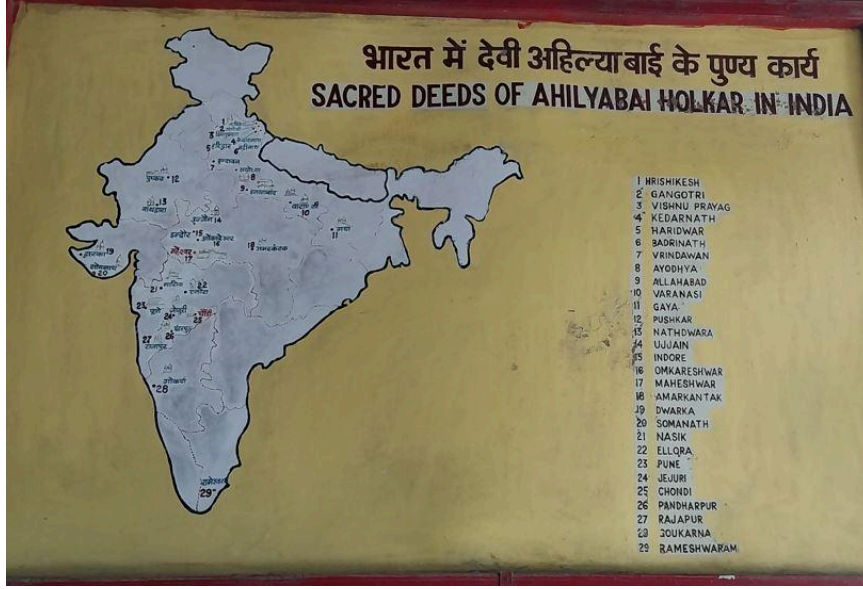
## শৈব তীর্থে 5

আমরা উনিশ ডিসেম্বর দুপুরে ওঙ্কারেশ্বর-এর হোটেলে পৌঁছে গাড়ীর মালিককে জানিয়েছিলাম, পরদিন সোজা না ফিরে মহেশ্বর হয়ে ফিরতে চাই। অতিরিক্ত এক হাজার টাকা লাগবে, জানিয়ে দিয়েছে। এদিকের রাস্তা বেশ ভালো। আমরা বারোটোর পর পরই মহেশ্বর পৌঁছে গেলাম। ছোট্ট শহর। ড্রাইভার একটা জায়গায় গাড়ী থামিয়ে বলল, এখানে নেমে হেঁটে যেতে হবে। আমরা নামলে, গাড়ী ডান দিকে সরু গলির মধ্যে পার্কিং এর জন্য গেল। নামার সাথে সাথেই একজন লোক এসে হাজির; বলল সে গাইড। দরাদরি করে তিনশ টাকায় রফা হল। গাইড বলল, সে গাড়ী ভেতরে নিয়ে যেতে পারবে। তাকে গাড়ী পার্কিং থেকে আনতে পাঠিয়ে আমরা পাশের একটি দোকানে চা খেতে চুকলাম। বড় ছড়ানো কড়াইতে রাবড়ি তৈরী করা হচ্ছে দেখে জানতে চাইলাম, ওটা কি হচ্ছে? দোকানদার ভদ্রলোক জানালেন, রাবড়ি। দাম জেনে এক পাত্র দিতে বললাম। এর মধ্যে আমাদের ড্রাইভার ফোন করে জানতে চাইল, গাইডের কথা মত গাড়ী নিয়ে আসবে কি না। আসতে বললাম। চা খেতে যেটুকু সময় লাগে তার মধ্যে দোকানদারের সাথে দুই একটা কথা হল। আমাদের গর্বের রাজ্যটি সম্বন্ধে বাইরের সাধারণ মানুষের কি সাংঘাতিক ধারণা, ওনার কথায় বুঝলাম। কি বললেন উনি? সে বড় বিস্তী ব্যাপার। লিখতে ভয় পাচ্ছি। শুধু এটুকু বলি; ওনার ধারণা, বুড়ো বয়সে একটু শান্তিতে থাকতে, আমরা বোধহয় ওদিকে চলে যাওয়ার মত জায়গা খুঁজতে বেরিয়েছি। আমরা রাবড়ি আর চা খেয়ে, অন্য একটা মিষ্টি কিনে, গাড়ীতে উঠে পড়লাম। মিনিট পাঁচেক চলে একটা হোটেলের পার্কিং-এ গাড়ী রেখে চললাম, গাইডের সাথে। এসব জায়গার ইতিহাস আমার প্রায় কিছুই জানা নেই। তাই গাইড যা বলে তাই শুনে নিই। তাছাড়া এই মহেশ্বর আমার এবারের ভ্রমণসূচীতে ছিল না, তাই কোন ইউটিউব ভিডিও দেখেও যাওয়া হয়নি। গাইডের কাছে যা জানলাম: এটি মহারানী অহল্যাবাই এর শেষের দিকের রাজধানী। ঐ মহীষসী মহিলা নিজের প্রজাদের জন্য অসংখ্য কর্মকাণ্ড করে গিয়েছেন। সেজন্য ওনাকে দেবী মনে করতেন, প্রজারা।

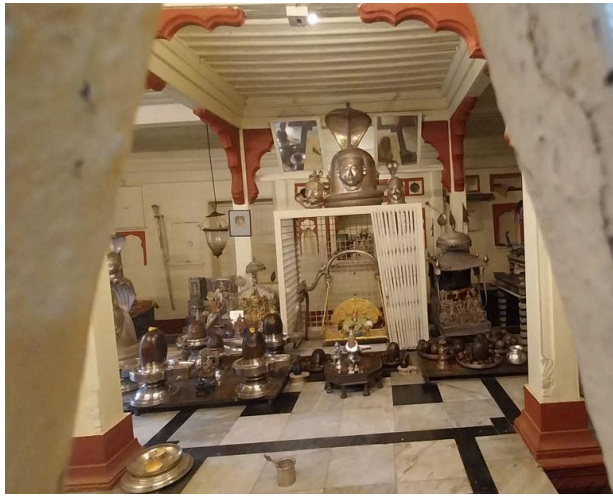


ওনার “রাজোয়াড়া” অর্থাৎ সভাগৃহ একটি দোতলা কাঠের বাড়ী। ইনি খুবই শিব ভক্ত ছিলেন। আর ছিলেন মা নর্মদার ভক্ত; সেই জন্যই নর্মদা নদীর তীরে এই রাজধানী সরিয়ে আনেন। ঐ রাজোয়াড়ার ভেতরে দাঁড়িয়ে সোজা নর্মদা নদী দেখা যায়; রাণীমা সকালে উঠে আগে নর্মদা দর্শন করে, দিনের শুরু করতেন। ঐ বাড়ীতে চুকতে, জুতো খুলে চুকতে হয়, মন্দিরে ঢোকান মত। গেটের বাম দিকের দেওয়ালে একটি ভারতের মানচিত্রে

देखानो हय्से, हिमालय थेके रामेश्वरम पर्यन्त मोट उन्नत्रिश जायगाय, महारानी अहल्या देवी, शिव मन्दिर, नर्मदा आर गप्पार घाट इत्यादी करे गियेछेन।



ये कोन राजवाड़ीर मिडजियाम येमन हय, एथानेओ तेमनि एकटि छोट मिडजियाम देखार मत, घुरे घुरे देखलाम। परदिन आमरा इन्दोरेर राजोयाड़ा प्यालेसेओ एरकम मिडजियाम देखेछि। भेतरेर उठाने एकटि तिन तलार समान उँचू गाछ देखलाम। गायड बलल, एहि एकटि मात्र गाछइ गोटा पृथिवीते आछे; एटि एकटि बेल गाछ, प्रतिटि बाँटाय बारोति करे पाता आछे। गाछे फलओ हय। पिछन दिके एकटि ठाकुर घर आछे। सेथाने “सोनार” सिंहासने, सोनार बिष्णु मूर्ति आछे। देखलाम। आर आछे अनेक शिव लिप्प।



सेहि कयकश बछर आगे थेकेहि चले आसछे एकटि प्रथा; प्रतिदिन एगारो हजार ना कि एगारोश, कालो माटिर शिव लिप्प तैरी करे पूजा करा हय। सेणुलि दुपूरेर पर नर्मदा नदीर जले विसर्जन देओया हय। एकटि गामलाय ओणुलि राखा छिल देखेछि। नदीर घाटेर दिक थेके फेरार समय देखलाम, एकजन महिला सेहि गामला

মাথায় নিয়ে নদীর দিকে চলেছেন। বাইরের উঠানে রাখা বিরাট কামানের সামনে বসে অনেকে ছবি তুলছে, আমরাও তুললাম। একটু কালচে রঙের দুর্গের মত গঠনের বাড়ীর ভিতরে একটি বড় শিব মন্দির।



মন্দির দেখে বেরিয়ে গেলাম নর্মদার ঘাটে। মন্দির থেকে অন্তত পঞ্চাশ সাত সিঁড়ি সোজা নেমে গেছে নদীর জলে। ঘাটের উপর কয়েকজন পূজার ডালা, মাছকে খাওয়ানোর জন্য আটার গুলি ইত্যাদি বিক্রী করছে। কিছু যন্ত্র চালিত নৌকাও আছে। নৌকা ভ্রমণের টিকিট ঘরে গিয়ে জানলাম, মাথা পিছু মাত্র পঞ্চাশ টাকা দিয়ে মিনিট দশেক ঘোরা যায়। আমরাও একটি দলের সাথে উঠে পড়লাম নৌকায়। সেই কালচে পাথরের দুর্গের মধ্যে দুটি আধুনিক, সিমেন্টের তৈরী ছোট মন্দির আছে।



একটি মন্দির বলল, পরশুরামের তৈরী; সেই মন্দিরের ভিতরে এগারোটি অক্ষয় প্রদীপ জ্বলছে। এদিক থেকে দেখলাম, দুর্গের গা ঘেঁসে একটি চার তলা আধুনিক হোটেল। আমাদের গাড়ী ঐ হোটেলের বাইরে, উপরে রাখা ছিল। পরে গাইড, আমাদের গাড়ী নিচের পার্কিং এ আনতে বলেছে। আমরা মন্দির দেখে ফিরে যখন জুতো পরছি, মন্দিরের পুরুতটি আমাদের গাইডকে ডেকে কিছু বলল। গাইড এসে বলল, ঐ হোটেলের মালিক এই পুরুত। হোটেলের পার্কিংয়ে গাড়ী রাখার জন্য গাইডের কাছে টাকা চাইছে। গাইড সাধারণত যেটা বলে সেই কথা আমাদের ড্রাইভার বলল। শাড়ীর দোকানে যাওয়ার কথা ড্রাইভার মনে করাল। আমরা জানতাম, এই সব জায়গায় দোকানে নিয়ে গিয়ে শাড়ী কেনাতে পারলে , গাইড কিছু কমিশন পায়। গাড়ী থেকে নামার সময়

দেখেছি, ঐ চত্বরে তাঁত চলছে, শাড়ীর দোকানও আছে। আমিই বললাম, চলো শাড়ী বোনা দেখি। আমার স্ত্রী আদৌ আগ্রহী ছিল না। দুর্গের মধ্যেও অনেক তাঁত চলছে, মহিলারা তাঁত চালাচ্ছেন দেখেছি। এ সবই মহারানীর ব্যবস্থা; মহিলাদের স্বনির্ভর করে তুলতে। আমরা তাঁত চালানো আর শাড়ীর দোকান দেখলেও, কিনিনি। জানলাম, মহেশ্বরী শাড়ীর ভালো নাম ডাক আছে। সিদ্ধ আসে কর্নাটক থেকে। গাইডকে বিদায় দিয়ে আমরা ইন্দোর ফেরার রাস্তা ধরলাম। প্রায় আড়াইটা বাজে, এবার কোথাও থেতে হবে। ড্রাইভার বলল, হাইওয়েতে ভালো হোটেল আছে। তাই চললাম। আধ ঘন্টা চলে, বড় রাস্তার পাশের একটি হোটেলে ঢুকলাম। আমাদের আগে যে ছয় সাত জনের দলটি হোটেলে থেতে বসেছিল, তাদের গোটা দুই ছেলে আমাদের দেখে হৈ হৈ করে উঠল; আবার দেখা হয়ে গেল বলে। আমি কিন্তু প্রথমে মনে করতে পারিনি, কোথায় ওদের সাথে দেখা হয়েছিল। পরে মনে পড়ল, এক ঘন্টা আগেই ওদের সাথে, মহেশ্বরের নর্মদা নদীতে নৌকায় উঠেছি। ওরা চলেছে মহাকাল দর্শনের জন্য। হোটেলে আমাদের খাওয়া খুবই সামান্য, সাদা দৈ আর সাদা ভাত। এখানে ডাল নিয়ে দেখি, ডালেও শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো দেওয়া। ওমকারেশ্বের এর মাইল চারেক আগে একটি বাজার মত জায়গায় দেখেছি, রাস্তার দুই পাশে অন্তত পঞ্চাশ জায়গায়, রাশি রাশি শুকনো লঙ্কার ছোট খাট পাহাড় সাজিয়ে বসেছে।



হোটেলের বিল মেটানোর সময়, আমরা কোথা থেকে আসছি, কোথায় চলেছি এরকম কিছু কথা হচ্ছিল। হোটেলের লোকটি বলল, এত কাছে দিয়ে চলে যাচ্ছ, মান্দুও ঘুরে যাও। বড় রাস্তা থেকে কুড়ি পঁচিশ কিমি দূরে হবে জেনে, ঘুরেই যাই ঠিক করলাম। আবার গাড়ীর মালিককে ফোন করে বললাম। আরও সাতশ টাকা দিতে রাজী হয়ে, চললাম মান্দু। ড্রাইভার বলল, যেতে এক ঘন্টার মত লাগবে; বেশী সময় খোলা পাবেন না। তাই সই। এই রাস্তায় যেতে যেতে, পাশে কিছু তুলা চাষের ক্ষেত দেখলাম; এক জায়গায় নেমে ছবিও তুললাম।



কার্গাস তুলা চাষ

মহেশ্বর আর এই পথেও কিছু মানুষকে লোটা কম্বল আর লাঠি নিয়ে হাঁটতে দেখেছি। এরাই সম্ভবত “পরিভ্রমাবাসী”, নর্মদা পরিভ্রমা করছেন। কারো সাথে কথা বলার সুযোগ হয়নি। মাল্ডু পৌঁছতে প্রায় সাড়ে চারটা বেজ গেল। কয়েক মাইল আগে থেকে রাস্তার পাশে, মাঠের ভিতর এক রকমের গাছ দেখা যায়; আফিকার বাওবাব গাছ মনে হবে। কাণ্ডটি জালার মত অনেকটা, উপরের দিকে কিছু ডাল। কিন্তু কোন গাছে কোন পাতা নেই। দু একটা গাছে অনেকটা শিমুল ফলের মত কয়েকটা ফল, দূর থেকে দেখেছি। গাড়ী পার্কিংয়ে রেখে আমরা হাঁটা শুরু করতেই একজন লোক বলল সে গাইড। পাঁচশ টাকা চাওয়ায় আমরা রাজী হলাম না। ফোর্ট এর গেট পর্যন্ত পাঁচশ মিটার মত রাস্তা হেঁটেই চললাম। কিছু লোক ই-রিম্বায় উঠে যাচ্ছে আসচে দেখলাম। এই রাস্তাটিও মহাকাল করিডোরের মত, লাল পাথরে বাঁধানো চলছে। শেষ একশ মিটার রাস্তার পাশে দোকান পাট বসেছে। অন্তত আট দশ জন ঝুড়িতে করে একরকমের ফল বিক্রি করতে বসেছে। ছোট ফলগুলি অনেকটা শিমুল ফলের মত। কিন্তু বড় কিছু ফলের আকার আকৃতি পেট মোটা পুরুলের মত। ওরা এই ফলগুলিকে “ইমলী” বলছে।



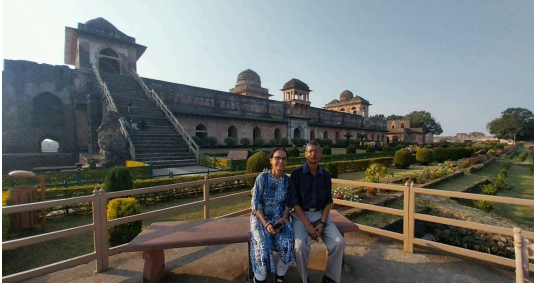
মাল্ডুর ইমলি

কি হয় এই ফল দিয়ে? প্রশ্ন শুনে, প্লাষ্টিক প্যাকেটে রাখা সাদা রঙের নুড়ি পাথরের মত জিনিস দেখালো। ঐ ফলের মধ্যে এরকম জিনিস আছে। দশ টাকা দিয়ে একটা প্যাকেট কিনে, মুখে একটা নুড়ি নিয়ে দেখলাম, তেঁতুল এর মত একটু স্বাদ। কিন্তু ৯৫% ই বীজ। পঞ্চাশ টাকা দিয়ে একটা ফল কিনে আনার ইচ্ছা থাকলেও, বোঝা বাড়ছে ভেবে নেওয়া হল না। ফেরার পথে আলো কমে যাওয়ায়, গাছের ছবিও তোলা হল না। ফোর্ট এর গেটের

কাছে জন তিনেক ছেলে, গলায় আই কার্ড ঝুলিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। ওদের একজন এগিয়ে এসে জানাল সে গাইড। তিনশ টাকা নিতে রাজী হল; ওকে নিয়ে চললাম। এই মাল্ধু ফোর্ট এর গেটে টিকিট কাটার অত্যাধুনিক ব্যবস্থা আছে। QR scan করে নাম ঠিকানা লিখে, অনলাইনে টিকিট কাটতে পারেন, বা অতিরিক্ত পাঁচ টাকা দিয়ে সাধারণ ভাবেও টিকিট কেটে ভেতরে যেতে পারেন। আমি মোবাইলে টিকিট করলাম, কুড়ি টাকা করে। ভেতরে ঢোকান পরই ডান দিকের একটি বাড়ীতে মিউজিয়াম। পাঁচটায় বন্ধ হয়ে যায়, তাই গাইড বলল, আগে দেখে আসুন। একটিই বড় ঘরে পুরাতন পাথরের মূর্তি, লিপি, মাটির আর ধাতুর বাসন ইত্যাদী সাজানো আছে।



বেরিয়ে এসে গাইড এর সাথে সামনে সুন্দর করে সাজানো বাগান, জলাশয়, পুরনো জাহাজমহল এইসব দেখতে দেখতে চললাম। গাইড ছেলেটি শিক্ষিত। বি এস সি পাশ করে গাইডের ট্রেনিং নিয়েছে। আমরা ঘন্টা খানেক ভেতরে ঘুরে, সবকিছু দেখে ফিরে এলাম। গাড়ীর দিকে এগিয়ে যাওয়ার রাস্তার পাশে একটি দোকানে বসে চা খেলাম। সাড়ে পাঁচটা বেজে গেল। ওদিকে আরও প্রায় চল্লিশ মিনিট পর সূর্য ডোবার কথা। একটা সানসেট পয়েন্ট থাকলেও আমরা আর এগোলাম না।



মাল্ধু জাহাজ মহলের সামনে

ডক্টর পাত্র আবারও ফোন করে খবর নিলেন। আমরা সকাল থেকে অনেক হাঁটাহাঁটি করে আর ওনার বাড়ীতে যাওয়ার উৎসাহ পেলাম না। বড় রাস্তায় গাড়ী পৌঁছতেই বেশ অন্ধকার হয়ে গেল। সন্ধ্যা ছয়টার পর থেকেই, ড্রাইভারের মোবাইলে বার বার ফোন আসতে থাকল। আমার মনে ছিল, এবার ইন্দোরের Retiring room সন্ধ্যা আটটা থেকে; আগে পৌঁছলে বাইরে বসে থাকতে হবে। সেক্ষেত্রে কুড়ি তারিক সন্ধ্যায় ছাপান্ন বাজার ঘুরে নেব। কিন্তু আমাদের স্টেশনে পৌঁছতে ঠিক আটটাই বেজে গেল। এত পরিশ্রান্ত লাগছিল যে, ঐ রাত্রে আর কোথাও বেরোলাম না। ইন্দোরের শহরতলীর কাছে পৌঁছে ড্রাইভার জানাল যে, আজ তাঁর সাত বছর বয়সের মেয়েটির জন্মদিন, তাই মেয়ে বারবার ফোন করছে। সে সাতদিন পর আজ বাড়ী ফিরছে, গাড়ীতে গাড়িতেই ঘুরে চলেছে। সতের বছর গাড়ী চালাচ্ছে, এবার ছেড়ে দিয়ে অন্য কোনো কাজে লাগবে ভাবছে। মেয়ের

জন্মদিনের খবরটি শুনে একটু খারাপ লাগল। মুখে কিছু না বললেও, মনে মনে নিশ্চয়ই আমাদের গাল দিয়েছে। এ ব্যাটারা দুপুরের পর ফেরার কথা, তাই না করে আরও দুই জায়গা ঘুরে রাত করে ফিরল। এবার আমাদের Retiring room এর ঘরের নম্বর চার। একটু পুরনো ধাঁচের বাথরুম। পরদিন সকালে উঠে দেখি ইঁদুরে খাওয়ার রাখার ব্যাগটি ফুটো করে, আমাদের বাড়ী থেকে ভেজে নিয়ে যাওয়া চিনা বাদাম এর প্যাকেট ফুটো করে, বাদাম খেয়েছে। ইঁদুরের কথা মাথায় ছিল না; সেক্ষেত্রে ব্যাগটি দেওয়ালে ঝুলিয়ে রাখা যেত। অনেক বছর ধরেই আমরা রেলের রিটায়ারিং রুমে থাকছি, এমন অপ্রস্তুত আর কোথাও হতে হয়নি। যারা এরকম, রেলের Retiring room এ কখনও থাকবেন, এই ব্যাপারটি মাথায় রাখবেন। আর একটি অসুবিধা হল, টাওয়েল দেবে না; আপনাকে গামছা নিয়ে যেতে হবে। আর গামছা মেলার জন্য, দড়ি। এর পরের Retiring room প্রয়াগরাজে। সেখানে আমার নিজের অমনোযোগের জন্য একটা বিশ্রী ব্যাপার হতে হতে বেঁচে গেলাম। ২৬.১২.২৪.



বাউডি অর্থাৎ কুঁয়া

## শৈব তীর্থে ভ্রমণ 6

আগেই বলেছি, ২১ শে ডিসেম্বর দুপুরে আমরা ইন্দোরের এক নম্বর প্লাটফর্ম থেকে প্রয়াগরাজের ট্রেনে উঠেছি। এদিক থেকে যাওয়ার সময় গোটা দুই অভদ্র ছেলে আমাদের সহযাত্রী হয়েছিল; উল্টো দিকের ট্রেনে একটি অত্যন্ত ভদ্র শিক্ষিত ছেলে আমাদের সাথে গোটা রাস্তা এল। ছেলেটি আমার মেয়ের থেকেও বছর পাঁচেকের ছোট। ওদের সরকারী চাকরীর প্রাথমিক অবস্থায় আছে। এবার উজ্জয়িনী পর্যন্ত দিনের বেলায় এলাম। ট্রেন লাইনের দু'পাশেই সবুজ গমের ক্ষেত। উজ্জয়িনী পেরনোর সময় আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। আরও ঘন্টা খানেক চলার পর ট্রেন পৌঁছল সন্ত হিরদারাম নগর স্টেশনে। এখানে এমনিতেই মিনিট পনের দাঁড়ানোর কথা; ট্রেন পৌঁছেছে প্রায় আধ ঘন্টা আগেই। তাই অনেক সময় দাঁড়িয়ে থাকল। আমিও প্লাটফর্মে নেমে একটু হাঁটাহাঁটি করে নিলাম। ওদিকে যাওয়ার সময় দেখেছি, আমাদের সহযাত্রী সেই “কিন্লোর বাচি” বাচ্চাটি তার বাবা মায়ের সাথে এখানেই নেমেছিল, ভূপাল যাওয়ার জন্য। এই সন্ত হিরদারাম নগর স্টেশনের প্লাটফর্মে নেমে অনেকে পোহা আর ধোকলা খাচ্ছে দেখে আমরাও এক পাত্র ধোকলা কিনে খেলাম। ডাল বাটা দিয়ে তৈরি; না মিষ্টি, না নোনতা, কেকের মত একটি সস্তা খাদ্য। এই ট্রেনও নির্ধারিত সময়ের দশ মিনিট আগেই প্রয়াগরাজে পৌঁছে গেল। তখনও সূর্য ওঠেনি। প্লাটফর্ম থেকে শুরু হল, সঙ্গমে নিয়ে যাওয়ার অটো আর গাড়ীর ড্রাইভারদের ঝোলাঝুলি। ঘন্টা দুই- তিন পরেই বেশ বুঝেগেলাম, কুম্ভ মেলার মাহাত্ম্য। একজন গাড়ীর ড্রাইভার আমাদের নিয়ে, রাস্তা দেখিয়ে কোথায় Retiring room এর জন্য কাগজ পত্র দাখিল করতে হবে, কোন দিকে সিঁড়ি সবই দেখাল। পারলে আমাদের ট্রলি ব্যাগ একেবারে দোতলায় পৌঁছে দিতে চায়। ওর সাথে কথা হয়ে গেল, আটটা থেকে বারোটা চার ঘন্টা গাড়ীতে ঘোরাবে। শহরের গোটা তিনেক দর্শনীয় স্থান দেখিয়ে সঙ্গমের ঘাটে নিয়ে যাবে; ভাড়া চারশ টাকা। ওর ফোন নম্বর নিয়ে বিদায় করলাম। এই প্রয়াগরাজের Retiring room আমার বুক করা ছিল, আগের সন্ধ্যা আটটা থেকে, তাই সকাল ছয়টায় ঢুকতে কোন অসুবিধা নেই। আমার হাওড়া ফেরার গাড়ী বিকেল সাড়ে চারটায়। সন্ধ্যা আটটা পর্যন্ত বুকিং। আমরা আটটায় বেরিয়ে একটায় ফিরলেও দুপুরে খেয়েদেয়ে ঘন্টা তিনেক বিশ্রাম নিয়ে নীচে নামব; এই ছিল আমাদের হিসেব। এই যে প্রধানমন্ত্রী আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করার সাত-আট দিন পর আমরা প্রয়াগরাজে পৌঁছব, এরকম কোন চিন্তা মাথায় ছিল না। চার মাস আগে টিকিট কাটার সময়, ইন্দোরের থেকে সোজা হাওড়া ফেরার টিকিট RAC হয়ে গেল। মনটা খুঁতখুঁত করছিল; আবার IRCTC ওয়েবসাইট খুলে, খোঁজাখুঁজি করে দেখলাম, প্রয়াগরাজে নেমে, ট্রেন পাল্টে এলে দুটি ট্রেনেই কনফার্ম টিকিট হচ্ছে। তাই নিয়ে নিলাম। মেলার কোন খবরই আমার কাছে ছিল না। আগের মেলার শেষের দিকে বেনারস থেকে গিয়ে একদিন ঘুরে এসেছিলাম। সেবার মেলা প্রায় ভেঙ্গে গেলেও গাড়ী চলাচলে অনেক বিধিনিষেধ ছিল। আমাদের সেবারের ড্রাইভারও একটু জেদি লোক ছিল। আমাদের শুধুই গঙ্গার উত্তর পারে নিয়ে গিয়ে ফিরে এসেছিল। শহরে প্রায় ঢোকাই হয়নি। এবার তাই শহরটা দেখব, সময় থাকলে যমুনার দিক দিয়ে সঙ্গমে যাব, এরকম ভাবা ছিল। হাতে অনেক সময় ছিল, তাই ফেরার পথে আর একটা তীর্থও ঘোরা হবে, এই পর্যন্ত। এখানে রেলের RAC টিকিটের ঝামেলার ব্যাপারটা একটু বলে রাখি। এবার যে তিন চার বার ট্রেনে ঘুরলাম, তাতে দেখলাম RAC কনফার্ম হয় না। পাশের নিচের বার্থে দু'জন, আঠাশ তিরিশ ঘন্টা যাওয়া বেশ কষ্টকর। এই RAC ব্যাপারটা

বেশ গণ্ডগোলের। আইনের ফাঁকে, রেল আপনাকে বসার জায়গা দিয়ে, শোয়ার ভাড়া নিচ্ছে। ধরুন আপনারা দুজন হাওড়া থেকে RAC টিকিটে বসে চলেছেন। মাঝে বারাণসীতে আপনার পাশের বার্থের একজন নেমে যাচ্ছেন। আপনি ভাবছেন, তাহলে তো বারাণসী থেকে আপনি ঐ বার্থ পাচ্ছেন। সেটা হবে না। বারাণসী থেকে অন্য একজন ঐ বার্থের কনফার্ম টিকিট নিয়ে উঠবেন; টিটি সাহেব এর কিছু করার নেই। লোকজন কী কষ্ট করে RAC টিকিটের এক বার্থে দুজন চলেছেন, এবার অনেক দেখলাম। তাই আমার পরামর্শ হল, ট্রেন বা তারিক পাল্টান; পারতপক্ষে RAC টিকিটের ভরসায় দূর পাল্লার ট্রেনে উঠবেন না।

আমরা প্রয়াগরাজের Retiring room এর দোতলায় উঠে দেখলাম, একজন কর্মচারী চেয়ার টেবিল নিয়ে বসে আছে। তাকে কাগজ দেখলাম; দু'শ সাত নম্বর ঘর তিন তলায়, যেতে বলল। তিন তলায় চেয়ার টেবিল থাকলেও কোন কর্মচারি নেই। ২০৭ নং এর দরজা খোলা দেখে আমরা ঢুকে গেলাম। ব্যাগ পত্র রেখে, ঘরে তালা ঝুলিয়ে আমরা বাইরে বেরোলাম, চা খেয়ে, গাড়ীর ভাড়া ইত্যাদীর একটু খোঁজ নিতে। স্টেশনের নিচে থেকে রাস্তা পর্যন্ত জন পাঁচ ছয় লোক, প্রয়াগের সঙ্গমে নিয়ে যাওয়ার জন্য ঝোলাঝুলি করে গেল। আমাদের গাড়ী ঠিক করা আছে বলে কাটিয়ে দিতে পড়লাম। প্রথম ড্রাইভার চারশ টাকা বলেছিল, এরা কেউ কেউ বারোশ টাকাও বলছে। Retiring room এ ফিরে এসে খেয়াল করলাম, বালিশের কভার কেমন তেল লেগে আছে মনে হল। শুধু এই জন্যই, তিন তলার কর্মচারীর খোঁজ নিতে নীচের লোকটির কাছে গেলাম। সে বলল, ওপরে অন্য লোক আছে, পাশের ২০৫ নম্বরে শুয়ে থাকতে পারে। উপরে এসে তিন তলার মহিলা কর্মচারীকে খুঁজে বের করলাম। সে তো, আমরা ২০৭ নম্বরে নতুন এসেছি শুনে অবাঁক। লোকজন ওকে না বলে চলে গেছে বলে বিরক্ত। যাইহোক, দুটি বালিশের কভার পাল্টে দিয়ে আমার বুকিং এর কাগজটি নিয়ে খাতায় লিখতে গেল। পাঁচ মিনিট পর ফিরে এসে বলল, তোমাদের তো সকাল আটটা পর্যন্ত বুকিং, সময় শেষ। আমি নিজের ভুলের জন্য অপ্রস্তুত হলেও, আটটায় বেরিয়ে যাবো, বলে দিলাম। ঐ মহিলা অবশ্য একবার বলেছিল, নিচে গিয়ে কথা বলতে পার। আমাদের তো গাড়ী আটটায় বলাই আছে, তাই তাড়াতাড়ি স্নান করে নিতেই ব্যস্ত হয়ে গেলাম। আমার স্ত্রী বলেছিল, নীচের অফিসে লেখা দেখেছে, 25% অতিরিক্ত দিয়ে সময় বাড়ানো যায়। গাড়ীতে দুটি ট্রলি ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে পড়ব, তাই আর ওসবে গেলাম না। পরে নীচে নেমে খোঁজ নিয়ে জানলাম, আটটার আগে এলে, সময় বাড়ানো যেত। সে তো হল; কিন্তু আমি ভাবছি অন্য কথা। বালিশ ময়লা না থাকলে তো আমরা ঐ মহিলাকে খুঁজতেই যেতাম না; আটটায় ঘরে তালা দিয়ে বেরিয়ে যেতাম। পরে যারা আসত, তারা একটা হুজুতে পড়ে যেত। এবার আমাদের হুজুতি শুরু হল। মহা কুস্তুর মহা হুজুতি!

আমরা ঠিক আটটায় Retiring room এর বারন্দায় বেরোতেই একটি লোক আমাদের পিছনে পড়ে গেল। সে তার গাড়িতেই আমাদের ঘোরাবে। প্রথমে আমরা বেশ বিরক্ত হলেও লোকটির অসিম ধৈর্যের কাছে হার মানতে হল। ওকে প্রথমেই বলেছি, আমাদের গাড়ী ঠিক করা আছে। কার গাড়ী? নরেন্দ্র ভাইয়ার। লোকটি আমাদের সাথে সাথে নিচে নেমে এসেছে। Retiring room এর অফিসে জন তিনেক লোকের পিছনে আমি লাইনে দাঁড়িয়ে; এই লোকটিও পাশে দাঁড়িয়ে। নরেন্দ্রকে ফোন করতে সে এসে গেল। এরা তিন চার জন মিলে তাকে ভাগিয়ে

দিল। এবার আমি একে ধমকেই বললাম, তুমি আমার পিছনে এলে আমি পুলিশ ডাকব। একটু সরে গেল।  
বুঝলাম, স্টেশন এলাকা এদের; নরেন্দ্র বাইরের লোক।



লোকটি খারাপ না

রাস্তায় বেরিয়ে ফোন করলাম, নরেন্দ্র আর ফোন ধরল না। পুলিশকে বললাম ব্যপারটা। একটু বয়স্ক পুলিশ বলল, না, এসব চলবে না। কোন লোক তোমাকে বিরক্ত করছে? আমি তখন রাস্তা থেকে অন্য গাড়ী ধরার চেষ্টা করছি। পিছন দিক থেকে একটি গাড়ী এসে আমাদের ডাকছে। ড্রাইভারের মাথার মস্কি ক্যাপ নেই, তাই এগিয়ে গেলাম। আমার স্ত্রী ওকে ঠিক চিনেছে। তাও ওকে জিজ্ঞেস করলাম কত টাকা নেবে? ছয়শ টাকা। ব্যাগ পত্র নিয়ে উঠে বসলাম। ও কিন্তু নির্বিকার ভাবে আমাদের প্রায় দেড়টা পর্যন্ত ঘোরাল। শেষে আমি নিজেই ওকে আটশ টাকা দিলাম। প্রথমে ঢুকলাম, হনুমান মন্দিরে। বেশ বড় বাঁধানো চত্বর। কিন্তু খুবই সাদামাটা মন্দির।

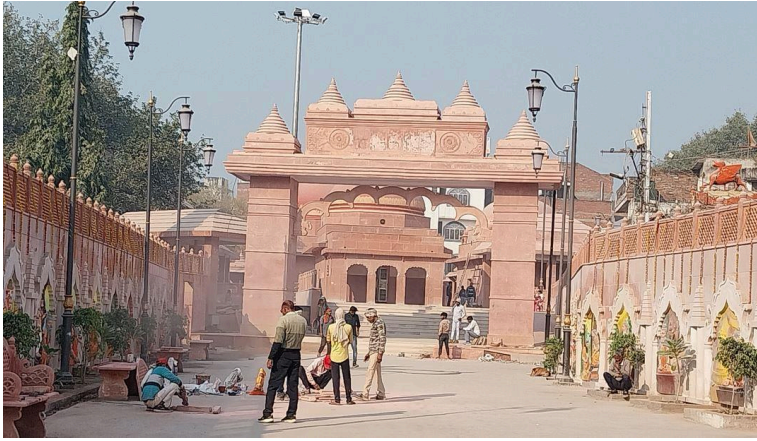


হনুমান মন্দির

মন্দিরের পর গেলাম, এক সত্যিকারের মহান স্বাধীনতা শহীদের মূর্তি দেখতে। এই জায়গার নাম, আজাদ পার্ক। এখন যেই জায়গায় এই মহান স্বাধীনতা সংগ্রামীর মূর্তি সেই জায়গায় উনি শহীদ হয়েছিলেন। বীর স্বাধীনতা সংগ্রামী চন্দ্রশেখর আজাদ মহাশয় এইখানে ব্রিটিশ পুলিশের সাথে গুলির লড়াই করে শহীদ হয়েছিলেন। বীর শহীদের পায়ের তলায় দাঁড়িয়ে ছবি তোলা হল।



তারপর গেলাম ভরদ্বাজ আশ্রম। শহরের মধ্যেই এটি। আশ্রম বলতে যা বোঝায় সেরকম কিছু নেই। অনেকটা জায়গা নিয়ে , লাল পাথরে বাঁধানো উঠান, কয়েকটা ছোট ছোট লাল পাথরে তৈরি মন্দির। কোন বাগান, গাছ বা কোন সাধুও নেই।



ওর প্রায় উল্টো দিকে আনন্দ ভবন। এটা মতিলাল নেহেরুর বাসস্থান ছিল। পরে , নেহেরুদের রমরমার সময় এটিকে একটি মিউজিয়ামে পরিবর্তন করা হয়েছে। মতিলাল নেহেরুর ব্যবহৃত আসবাব, অনেক ছবি ইত্যাদী দিয়ে , পরিপাটি করে সাজানো। বেশ বড় এলাকা নিয়ে, সুন্দর বাগান ইত্যাদি দিয়ে সাজানো। মাথাপিছু পঁচিশ টাকা টিকিট কেটে ভেতরে ঢুকলাম। ওখানে একটি তারা মণ্ডলও আছে। আমরা সাড়ে দশটা থেকে আধ ঘন্টা দেখে নিতে পারতাম। আমার স্ত্রী উৎসাহ দেখাল না।



ওখান থেকে গেলাম, সতী পিঠ মন্দির ( জালপা দেবী) দেখতে। একটু অগোছাল, ভাঙ্গাচোরা পাথুরে চত্বর পেরিয়ে শক্তি পিঠ। মন্দিরে মূর্তি কিছু দেখলাম না; একটু অদ্ভুত কাপড়ের তৈরী চোঙ মত লম্বা জিনিস ছাদের থেকে ঝুলছে, সেখানেই লোকে ডালা দিচ্ছে। পিছন দিকে ঘিঞ্জি করে বসা প্রচুর ডালা বিক্রির দোকান। প্রায় সবাই কাঁচের চুড়ি বিক্রী করছে। একটি মন্দিরের চাথালে, একজন রক্তস্বর পরিহিত প্রৌঢ় মানুষ, বাঁপিতে একটি গোথরো সাপ নিয়ে বসে গেছে। লোকে সাপ দেখে টাকা দিয়ে যাচ্ছে। এই মন্দিরেরও লাল পাথরে উল্লয়ন হচ্ছে।



সতী পিঠ মন্দির ( জালপা দেবী)

এবার সোজা চললাম কুষ্টি মেলায়। যমুনার তীরে পৌঁছানোর জন্য বেশ ঘুরে ঘুরে যেতে হল। এখন থেকেই তাঁবু পড়তে শুরু করেছে। ট্র্যাফিক জ্যাম কমাতে গাড়ী ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। রাস্তার পাশে পাশে বায়ো টয়লেট বসে গেছে। গঙ্গার উত্তর পারে কয়েক কিমি যায়গা নিয়ে তাবুর মেলা দেখা যাচ্ছে। গঙ্গার উপর অস্থায়ী ভাসানো সেতু। আগেরবার এই রকম একটি সেতুর ওপর দিয়ে আমাদের গাড়ী নদী পেরিয়েছিল। এবার আমরা যমুনার এই পারে থেকে গেলাম। কয়েকশ গাড়ী আর অটোর জটলায় আমাদের গাড়ী থামিয়ে ড্রাইভার নেমে আসতে বলল। গাড়ীতে জুতো খুলে রেখে বালীর উপর দিয়ে হেঁটে চললাম নৌকা ধরতে। ড্রাইভার এর মধ্যে মোবাইলে নৌকার লোককে ডেকে নিল। বেশ দরাদরি করে বাইশ'শ টাকায় রফা হল। দাঁড় টানা নৌকায় আমরা দুই জনই উঠলাম। দলের সাথে উঠলে ফিরতে চার পাঁচ ঘণ্টা লেগে যায়, এরকম নানান যুক্তি দিয়ে, আমাদের একটি

নৌকা নিতে বলল। দলে গেলে সময় বেশী লাগবে ঠিকই। কারণ দলের দশ জন যদি আলাদা আলাদা করে পূজা পাঠ, স্নান ইত্যাদি শুরু করে, কত সময় লাগবে বলা মুশ্কিল। আমরা মিনিট দশেক সময়ে যমুনা পেরিয়ে মাঝখানের চড়ে পৌঁছলাম।



যমুনা নদীতে নৌকা

আমাদের আশেপাশে কয়েকশ নৌকা ঘোরাফেরা করছে। মাঝি জানাল, মোট দশ হাজার নৌকা ওখানে চলছে। চড়ে সব নৌকা বাঁধার জায়গা নেই; একটি নৌকা থেকে আর একটিতে পা দিয়ে চড়ে বাঁধা পাওয়ার নৌকায় পৌঁছতে হয়। আমি নৌকাতে জামা প্যান্ট পাল্টে, গামছা নিয়ে পাওয়ার নৌকায় উঠেছি। কিন্তু পান্ডা দেখে নিয়েছে, এই নৌকায় মহিলা বসে আছে। দুজনকে পূজা করিয়ে বেশী দক্ষিণা নেবে, তাই নানান ভাবে বুঝিয়ে একেও ডেকে আনল। এবার আমাদের দুজনের ছোট হাতব্যাগ দুটি নিয়ে আমার স্ত্রীও পাওয়ার নৌকায় এল। একটি থালায় পাঁচটি নারকেল দিয়ে, আমাদের মাথায় একটু জল দিয়ে, মন্ত্র পাঠ করিয়ে, কত টাকা দক্ষিণা নেবে তাই নিয়ে জোর দরাদরি করলো। শেষ পর্যন্ত আমি সাড়ে সাতশ টাকা দিয়ে রফা করলাম। নারকেল ওদের মাচার পাশেই জলে ভাসিয়ে থালা ফেরৎ দিলাম। ঐ নারকেলই আগামী তিনমাস ধরে জলে ভাসবে আর পাওয়ার ছেলে তুলে তুলে খালায় সাজাবে। আমি একাই, চশমা আমার স্ত্রীর কাছে রেখে, চড় পেড়িয়ে, সঙ্গমে ডুব দিতে চললাম। আমার স্ত্রী পাওয়ার নৌকায় বসে মোবাইলে ভিডিও, ছবি তোলায় চেপ্টা করে গেল। চড়টি প্রায় দু-তিনটি ফুটবল মাঠের মত হবে। এদিকে পান্ডাদের নৌকা আর মাচা। ওদিকে বেশ কিছু ডালার দোকান। চড়ের থেকে ফুট পনের দূর দিয়ে, প্লাষ্টিকের বড় বড় ফাঁপা ভাসানোর জিনিস দিয়ে বেড়া দেওয়া। বেড়া পর্যন্ত হাঁটু জল। বেড়ার উপর দিয়ে পেরিয়ে গঙ্গার দিকে অন্তত পঞ্চাশ শাট ফুট এড়িয়ে হাঁটুর উপর জল পেলাম। সেখানেই একটা ডুব দিলাম। কিছু কিছু লোক একশ দেড়শ ফুট এগিয়েছে, সেখানেও কোমর জল নেই।



স্নান করার পর আমার মনে হলো, প্রয়াগ সঙ্গমের জল একটু বাড়ী নিয়ে যাই। পাওয়ার নৌকায় ফিরে গিয়ে, স্ত্রীর কাছে দশ টাকা নিয়ে আবার গঙ্গার দিকে চললাম। একটা জল নেওয়ায় জ্যারিকেন কিনে, বেড়ার ওপার থেকে জল ভরে নিলাম। আমি যাওয়ার আগে থেকেই কেউ কেউ প্রদীপ জ্বালিয়ে পূজা করছিল, তারা তখনও পূজা করে

চলেছে। আমাদের নৌকায় ফিরে জামা প্যান্ট পরে নিলাম। দুপুরের রোদে , আমরা যমুনা পেরিয়ে ফিরে আসার মধ্যেই আমার গামছা শুকিয়ে গেল। বালু চরের দু 'শ মিটার মত উপরে "শুয়ে থাকা হনুমানের" মন্দির আছে। গাড়ী ওদিকে নিয়ে যেতে দিচ্ছে না। আমরা আর ওদিকে হেঁটে এগোলাম না। সোজা স্টেশনে ফেরার রাস্তা ধরলাম।



২৩.১২.২৪। সকাল ৬টা ১০ এ , হাওড়া ব্রীজের কাছে



RPF Route March at Prayagraj Stn

স্টেশন রোডে এসে ড্রাইভার কে জিজ্ঞেস করলাম কোথায় থাওয়া যায়? সে স্টেশনের উল্টো দিকে চলে যাওয়া একটি রাস্তা দেখিয়ে বলল, ঐ দিকের দোকানগুলি ভালো, স্টেশন রোডের দোকানগুলি ভালো না। আমাদের ট্রলি ব্যাগ দুটি ছিল বলেই সোজা স্টেশনে ফিরে এলাম। স্টেশনের ভোজনালয়ে খেয়ে নিয়ে, প্রতিক্ষালয়ে এসে ঢুকলাম। ট্রেন দুই আড়াই ঘন্টা পর। ফাঁকা ফাঁকা প্রতীক্ষালয়ে অনেকে লম্বা ধাতব বেঞ্চে লম্বা হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে; আমিও ঘন্টা খানেক শুয়ে থাকলাম। ট্রেন আসচে বিকানিরের দিক থেকে। প্রয়াগ রাজে মিনিট কুড়ি পরে এলেও, হাওড়ায় কয়েক মিনিট আগে পৌছে গেলাম। দূরের ট্রেনে মাঝ পথে ওঠার কিছু সমস্যা থাকে। আমরা যেই জায়গায় আমাদের বার্থ পেয়েছি, তার আশে পাশে যারা আসচে আগে থেকেই, তাদের বিরাট বিরাট ব্যাগ, বোঝায় সিটের তলা ঠাসা; আমাদের ব্যাগ রাখার জায়গা নেই। মহিলারা উপরের বার্থে বসেই যা থাকে, তার খোসা, প্যাকেট সব নীচে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে। সামান্য বোধ বুদ্ধিও নেই। ভাগ্য ভালো, ঐ দলটি এক ঘন্টা পরই নেমে গেল। ওদের গোটা দশেক বোঝা বেরকরে নেওয়ার পর দেখা গেল, একেবারে গোয়াল ঘর বানিয়ে রেখে গেছে। পরিষ্কার করার লোকজনকে ফোন করে ডেকে আনা হল। ওরা দুজনে একটা বড় প্লাষ্টিকের ব্যাগ

এনে, ময়লায় ভরে নিয়ে গেল। ভোরের বেলা হাওড়ায় নেমে, বহুদিন পর বাস ধরে শিয়ালদা স্টেশনে এলাম। শিয়ালদাতো আমাদের পাড়ার স্টেশন। সকাল সাতটার আগেই বাড়ী ফিরে এলাম। ২৭.১২.২৪.

\*\* কিছু মান্যজন আমার এই লেখাগুলি এক জায়গায় গুছিয়ে , PDF করে দিতে আদেশ দিয়েছেন। কাল থেকে সেই কাজে হাত দেব। আজই মাদুরাই এর ওদিকের সব হোটেল বুকিং করে নিলাম।

\* 2019 সালে মেলা ভাঙ্গার সময় বেনারস থেকে কুস্তে গেছলাম। সেই লেখাটা সাথে দিলাম।

## বারানসী- বার্থক্যের আগেই ( 2018)

মাস তিনেক আগে ট্রেনের টিকিট কাটার সময় মেয়ের ফেরার ট্রেন নিয়ে একটু অনিশ্চয়তা ছিল ; তাই ওর ট্রেনের থেকে দু ঘন্টা পরের একটা বাজে ট্রেনেই আমরা ফিরব ঠিক করেছিলাম। ট্রেন, বিশেষ করে ভারতীয় ট্রেন কোনদিনই সময়মত চলনা, এটা কোন নতুন খবর নয়। তবুও মেয়েকে ট্রেনে উঠিয়ে দিয়ে, আমরা ঘন্টা দুই পরে ট্রেনে চাপার বুদ্ধিতে এই বাজে গাড়ীটার টিকিটই কেটেছিলাম। বেনারসে সন্ধ্যা আটটায় নির্দিষ্ট সময় ছিল এ গাড়ীর। আটটা পর্যন্তই রিটার্নিং রুম নেওয়া ছিল। ব্যাগপত্র গুছিয়ে বেরনোর সময়ই দেখলাম, গাড়ী তিন ঘন্টা লেটে চলছে।

নিচে নেমে চা খেয়ে ওয়েটিং হলে ঢুকলাম আটটা নাগাত। ঢুকতে ঢুকতেই শুনলাম ঘোষণা হচ্ছে, ঐ গাড়ী এক ঘন্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট দেরীতে আসছে। বসেই আবার রেলের আপ খুলে দেখলাম। এখানে দেরীর হিসেবে কোন ভুল নেই। তবুও, ইংরেজী মতে আজই ট্রেনটাতে চড়ার একটা ক্ষীণ আশা নিয়ে বসেছি। সময় কাটানোর তাগিদেই শুরু করলাম লেখালেখি।

আলেকজান্ডারের সৌভাগ্যের জন্য এক এক সময় ঈর্ষা হত। এখন দেখছি ওনার দুর্ভাগ্য যে উনি সেলুকাসকে নিয়ে, "বিচিত্র এই ভারতীয় রেল " দেখে যেতে পারেন নি। একই বেনারস থেকে মেয়ে তিন ঘন্টা আগে ট্রেনে উঠেছে। সেই ট্রেন আমাদের ট্রেনের এক ঘন্টা পরে আসানসোলে পৌঁছেছে।

ওটা কোন অভাগা ট্রেন? হ্যা, বাঙালির আর এক দুর্বলতা, বেনারস যাওয়ার 'বিভূতি এক্সপ্রেস'। বিভূতি নামটার উৎস কি জানিনা। বাংলার প্রিয় সাহিত্যিকের নামে হলে তো অবশ্যই গর্বের। কিন্তু বাবা বিশ্বনাথের বিভূতি হলে তো, কলিকালে সে বিভূতি এমন চার ঘন্টা পরেই মালুম হবে।

শেষ পর্যন্ত আমরা মাত্র তিন ঘন্টা দেরীতে কোলকাতা স্টেশনে পৌঁছতে পেরেছি। কিন্তু বিভূতি এক্সপ্রেস হাওড়ায় পৌঁছেছে সাড়ে ছয় ঘন্টা দেরীতে।

তা, ঐ যে বাবার বিভূতির কথা বললাম; আমাদের এবারের ভ্রমণে ওরকম কোন বিভূতির আকাঙ্ক্ষা ছিল না। সাহিত্য সিনেমায় বেনারসের গল্প অনেক শুনেছি। বিশ্বনাথ দর্শনের কোন পরিকল্পনা আমাদের ছিল না। দশাশ্বমেধ ঘাট, বেনারসের গলি এমনকি গলিত ঘোরা ষাঁড় দেখার ইচ্ছা নিয়েই গেছিলাম।

স্টেশন থেকে অটো ধরে ঘাটের কাছে হোটেলে যেতে হয় জানতাম। গুণ্ডলদাদার হিসেবে ওটা চার কিমি রাস্তা। স্টেশনে নামার সাথে সাথেই অটোওলা পিছনে পড়ে থাকল। ভাড়া দুশো টাকা। কিন্তু হোটেল থেকে এক কিমি দূরে

নামাবে। বড় রাস্তার উপর অনেক ভালো হোটেল আছে, একথা বলতেই, ওদের অটোওলা না ভেবে, হোটেলের দালাল মনে হল। দুজনকে সঙ্গে সঙ্গে বিদায় করলাম। আমাদের হোটেল অনলাইন বুকিং করাই ছিল। অটো ষ্টান্ডে পৌছতে এক বয়স্ক চালক ডেকে জানতে চাইল, কোথায় যেতে চাই। ভাড়া ঐ দুশো টাকাই। হোটলে ফোন করে জানতে বলল, হোটেলের কাছে কোথায় পর্যন্ত অটো যায়। পরে নিজেই হোটেল মালিকের সাথে কথা বলে জানাল যে, ঐ এক কিমি দুরেই দাঁড়াবে। তবে দশাশ্বমেধ ঘাটে পৌছে ফোন করলে, হোটেলের লোক এসে নিয়ে যাবে।

চার কিমির জন্যে দুশো টাকা ভাড়া যথেষ্টই বেশী ; কিন্তু ট্যুরিস্টের কাছে ভাড়া বেশী নেবে, এটাই এ দেশের দস্তুর। ষ্টেশন থেকে প্রথম এক কিমি রাস্তা বেশ চওড়া। এরপর অটো সরু সরু গলিতে বেশ ঘুরল। সেটা ঐ দুশো টাকাকে বেশী না মনে হয় সেজন্য, নাকি বড় রাস্তায় আরও বেশী সময় লাগত, ঠিক বুঝলাম না। ঘুরেফিরে এক সময় বড় রাস্তায়ই পৌছলাম। নামিয়ে দিয়ে সোজা রাস্তায় হাঁটতে বলল।

সত্যিই ও রাস্তায় অটো চলা সম্ভব নয়। আমাদের তিনজনের হাতেই হালকা ব্যাগ। তবুও অষ্টমীর সন্ধ্যায় কলকাতার রাস্তায় হাঁটার মত, ধাক্কাধাক্কি করতে করতে এগোলাম। হোটেলের নাম বলে সুবিধা হবে না বুঝলাম। মুন্সীঘাট কোনদিকে জানতে জানতে এগোতে থাকলাম।

একটা গলি মত রাস্তাদিয়ে ডানদিকে চললাম। পরে বুঝেছিলাম, গলি বললেও, ওটাই একটা ব্যস্ত রাস্তা। অনেক ছোটখাটো হোটেল আছে ঐ রাস্তায়। গলির গলি, তস্য গলি পেরিয়ে, একসময় আমাদের হোটলে পৌছলাম। এত সুন্দর একটা হোটেলের ঢোকান মুখটা কত সংকীর্ণ হতে পারে, না দেখলে বিশ্বাস করা মুশকিল।

হোটেলের ঘরে ব্যাগপত্র রেখে ঘাট দর্শনে বেরোলাম।

হোটেলের মেয়েটি যদিও বলেছিল, এইতো সামনেই ঘাট, আমরা সেই বড় গলিতে নেমে বেশ কিছুটা এগিয়ে গেলাম। এক সময় মনেহল, বোধহয় ভুল রাস্তায় এগোচ্ছি। লোকজনকে জিজ্ঞাসা করে আবার পিছিয়ে আসতে হল। ঐ গলিতে এগোতে গিয়েই একটা সাধারণ জিনিষ লক্ষ্য করলাম। এক বুড়িমা রাস্তার পাশের পৌঠায় বসেছিলেন। ঠেলা গাড়ীতে সন্ধিওলা যাচ্ছিল; তাকে পরিষ্কার বাংলায় জিজ্ঞেস করলেন, "পালং শাক আছে?" পরে মুদির দোকানে সাবান কিনতে গিয়েও দেখেছি, দোকানদার পরিষ্কার বাংলায় কথা বলছে। ওটা যে বাঙালীটোলা, বেশ মালুম হচ্ছিল। পরে সারনাথের শাড়ীর দোকানেও দেখেছি, বিক্রেতা সুন্দর বাংলা বলছে।

ঐ বড় গলি থেকে কয়েক সিঁড়ি উঠে , আরও সরু গলি ধরে , একে বেঁকে তিরিশ গজ মত গিয়ে হঠাৎ সামনে দেখি, সুন্দর নীল জলের গঙ্গার দিকে নেমে গেছে অনেক সিঁড়ি। ওটা নারদ ঘাট। ঐ সিঁড়ির কয়েকটা ধাপ চওড়া করে , ডান দিকে, বাম দিকে রাস্তা হয়ে চলে গেছে। বাম দিকে মুন্সি ঘাটের পরই দশাশ্বমেধ ঘাট।



### দশাশ্বমেধ ঘাট

বেনারসের সাথে বাবা বিশ্বনাথের নাম যতোটা জড়িয়ে, তার থেকেও বেশী বোধহয় দশাশ্বমেধ ঘাটের নাম জড়িয়ে। আজকের প্রজন্মের কোন কুইজে বিশ্বনাথ মন্দির কোন শহরে জিঞ্জেস করলে হয়তো আশি শতাংশ ছাত্র একবারে উত্তর দেবে; কিন্তু দশাশ্বমেধ ঘাটের নাম করলে, একশ শতাংশই মুহূর্তে ঠিক উত্তরটি দেবে। এবং অবশ্যই এ কৃতিত্ব সত্য্যজিতবাবুর।

আমরাও বেনারস বেড়াতে যাওয়ার জন্য হোটেল খোঁজার সময়, প্রথম শর্তই ছিল, ঐ দশাশ্বমেধ ঘাটের কাছে হতে হবে। সেই স্বপ্নের ঘাটের কাছে পৌঁছেই গেছলাম অবশেষে।

আমার যে কোন ভ্রমণ অভিজ্ঞতা লেখার প্রধান শর্তই হল, জায়গাটার সব রকম বর্ণনা, যাওয়ার রাস্তা, খরচ খরচা সব লিখব, কিন্তু আমার কেমন লাগল, সেকথাটা মানে মানে পাশ কাটিয়ে যাব। আমার একটা জায়গায় গিয়ে কেমন লাগল, আর মেদিনীপুরের চপমুড়ি খেয়ে কেমন লাগল, দুটোই একান্তই যার যার ব্যক্তিগত রুচির ব্যাপার। আমার নোনতা পছন্দ বলে সবারই নোনতা ভালো লাগবে, এমন তো কোন আইন তৈরী হয়নি!

আমরা নারদ ঘাটের বেশ কয়েকটা সিঁড়ি নেমে এলাম। সামনে স্বচ্ছ জলের গঙ্গায় অসংখ্য ছোট ছোট নৌকা চলছে। যতো নৌকা চলছে, বাঁধা আছে তার দশগুণ। বেশকিছু নৌকা ভুটভুটি যন্ত্রে বেশ জোরেই ছুটছে; আবার একজন মাঝীই দুটো দাঁড় টেনে নৌকা চালাচ্ছে, কোন হাল নেই, এমনও অনেক। একটা ব্যাপার ওপর থেকে বোঝাই যাচ্ছিল না, সেটা হল নদীর স্রোতের মুখ কোনদিকে!

পরে জলে স্নান করতে নেমেও দেখেছি, স্রোত প্রায় নেই। ঘাটের উল্টোদিকের পাড়ে বিস্তীর্ণ বালুচর। ওপাড়েও অনেক লোক নৌকাকরে গিয়ে স্নান করছে। ওপাড়ে গরু কুকুরও ঘুরছে। পরে, বিকেলে নৌকায় ঘোরার সময়, মাঝিকে জিপ্তেস করে জেনেছিলাম যে,ওপাড়ে জলের তলায় শুধুই বালি,আর জল অনেক দূর পর্যন্ত অগভীর,তাই লোকে ওদিকে স্নান করতে যায়। কিন্তু আমার ধর্মভীরু সেজদার মতের ওটা বিপরীত। সেজদার মতে, " গঙ্গার পশ্চিম কূল, বারাণসী সমতুল।"

আমরা বাঁদিকে একটু হেঁটে দশাশ্বমেধ ঘাটে পৌছে গেলাম। সব ঘাটেই কিছু লোক স্নান করছে। তবে দশাশ্বমেধ ঘাটে স্নানের যাত্রী অনেক বেশী। আমাদের ঐটুকু হাঁটার মধ্যেই জনাদুই নৌকার দালাল এসে পিছনে পড়ল। আমি কমাস আগে ঘুরে আসা, ভ্রাতৃপ্রতীম ডাক্তার প্রসূনের কাছে নৌকার ভাড়া ইত্যাদি জেনেই গেছিলাম। দুপুরে আমাদের নৌকায় ঘোরার কোন পরিকল্পনা ছিল না। তবে এটুকু বুঝলাম, বেশ দরদাম করতে হবে। মুন্সীঘাটে ফিরে এসে আমি আর আমার স্ত্রী স্নান করলাম। ঠিক মাঝ দুপুর। তার ওপর স্টেশনে নেমে হোটেলে পৌছতে প্রায় ঘেমেই গেছিলাম। তাই , পূণ্য লাভের থেকেও, ওরকম টলটলে জলে স্নান করার লোভই বেশী হল। গামছা , কাপড় চোপড় প্লাস্টিকের ব্যাগে নিয়েই বেরিয়েছিলাম। স্নান করার জন্য একটা সাবান কিনতে ওপরে উঠতে হল। জলের কাছ থেকে একেবারে ওপর পর্যন্ত পঞ্চাশটি সিঁড়ি উঠতে হাঁটু ব্যথা হয়ে গেল।

আমরা যে জায়গায় স্নান করতে নামলাম, আমাদের ঠিক আগেই একজন মহিলা আর তাঁর স্বামী ওখানে স্নান করছিলেন। প্রায় পনের কুড়ি ফুট দূরেও ভদ্রলোকের নাভি সমান জল দেখেছি। জলের তলার গোটা দুই সিঁড়ি বেশ পিছল। সাবধানে পা টিপে টিপে নামতে হল। তারপর পলি মাটিতে পা কিছুটা বসে যাচ্ছিল। কোমর জলে নেমে দেখলাম, নদীর জল কিন্তু পুকুরের মত, কোন স্রোত নেই। তবে জল বেশ ঠান্ডা। ছোটবেলায় গ্রামের পুকুরে স্নানের অভিজ্ঞতা থেকে জানি,জলে একটা ডুব দিতে পারলে আর ঠান্ডা লাগে না। প্রায় বছর আটেক পুকুরে স্নানের সুযোগ হয়নি। বারানসীর গঙ্গায় দশ ফুট মত সাঁতারও কাটলাম।



আমার স্ত্রী ঘাটেই রাখা একটা টিনের বাক্স মত ঘরে ঢুকে কাপড় পাল্টে নিল। পরদিন ভোর থেকেই দেখেছি, প্রথমদিন দুপুরেও দেখলাম, দশাশ্বমেধ ঘাটে অসংখ্য নারী পুরুষ পাশাপাশি স্নান করছে। ওখানে পোষাক পাল্টানোর কোন ঘর নেই।

মুন্সীঘাট থেকে দশাশ্বমেধ ঘাটের দিকে এগোতেই দু'তিনজন নাপ্পা সাধু চোখে পড়ল। একটা পাথরের চাখাল মত জায়গায়, অতিসাধারণ একটা কালো প্লাস্টিকের ত্রিপল টাঙিয়ে তার তলায় আশ্রয় নিয়েছে। ত্রিপলের ঠিক বাইরে অনেকটাই ধূনীর ছাই জমা হয়ে আছে। ঐ নাপ্পা সাধুদের মত দশাশ্বমেধ ঘাটের কাছাকাছিই আরও অন্তত আট দশজন নাপ্পা সাধু দেখলাম। সবারই একটা জিনিসে মিল, তা হল সবাই গায়ে বেশকরে ছাইভস্ম মেখে নিয়েছে। বেশীরভাগই নিজের তালে আছে, কিংবা নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছে। এক দুজনকে দেখলাম, আমাদের মত সাধারণ যাত্রীদের কাছে হাত পাতছে।

ওদের জীবনদর্শন বা সাধনা নিয়ে সামান্য যেটুকু পড়াশুনা করে জেনেছি, তার সাথে এই ঘাটের হট্টমেলায় বসে থাকাকে মেলাতে পারলাম না। ভোর থেকেই দলে দলে যাত্রী, বোচকা বুচকি নিয়ে আসছে। ঘাটের ওপর ব্যাগপত্র রেখে, স্নান করতে নেমে যাচ্ছে। পুরুষরা কেউ জাগিয়া পরে, কেউ গামছা পরে নামছে। মহিলারা প্রায় সবাই শাড়ী ইত্যাদি সবকিছু পরেই ঘাটে নেমে, কোমরজলে ডুব দিচ্ছে। ডুবদিয়ে উঠে, দু'চার সিঁড়ি উপরেই যে যার মত পোশাক পাণ্টে নিচ্ছে।

হয়তো একশো ফুট চওড়া হবে এই দশাশ্বমেধ ঘাট। জল থেকে পাঁচ সাত সিঁড়ি উপর থেকেই পূজারী পন্ডিতদের বসার চৌকিগুলি পাতা। চৌকি আর পাথরের চাখাল মিলে অন্তত জনাকুড়ি পন্ডিত বসার ব্যবস্থা। এই পূজারী পন্ডিতদের সবারই পোশাক প্রায় একই রকম। রঙীন পাঞ্জাবি আর ধুতি। কপালে তিলক কাটা। ভোর সাড়ে পাঁচটাতেই দেখেছি, অন্তত দশজন পন্ডিত সেজেগুজে, তিলক কেটে বসেগেছে।

এই পন্ডিতদের একজন, সূর্যোদয়ের আগেই চাখালে পূজার দোকান সাজিয়ে বসেছিল। কোন একজনকে সম্ভাব্য খন্দের বুঝে, "হ্যালো বাবু, ইধার আইয়ে", বলে ডাকাডাকি করতে শুরু করল। ঘাটের চাখালের আশেপাশে দু'একজনের মাথা ন্যাড়া করা হচ্ছে দেখলাম। ওরাই সম্ভবত ঐসব পূজারী পন্ডিতদের কাছে শ্রাদ্ধ শান্তি ইত্যাদি করে। ঐসব পূজারীদের পসরায়, বড় বড় বাঁশের তৈরী ছাতার তলায়। বাঁশের চাঁচের তৈরী ছাতাগুলির ওপর পলিথিনও লাগানো আছে। বৃষ্টি রোদ দুইই আটকাবে।

আমরা সূর্যোদয় দেখতেই ভোরে গিয়েছিলাম। বেনারসে বোধহয় কলকাতার থেকে আধঘন্টা মত দেরীতে সূর্য ওঠে। কিন্তু স্নানের যাত্রী ভোর পাঁচটাতেই কয়েকশ এসেগেল। সন্ধ্যার মত ভোরেও অনেকে নদীতে প্রদীপ ভাসাচ্ছিল। আর ছিল ফটোগ্রাফারদের দৌড়ঝাঁপ। বেশীরভাগই আমার মত মোবাইল ক্যামেরায় ছবি তুলতে ব্যস্ত। অনেক বিদেশিনী বড় ক্যামেরায় ছবি তুলেই যাচ্ছে দেখলাম। অনেকক্ষণ ধরেই দেখছিলাম এক মেমসাহেব আর তাঁর কিশোরী কন্যা নৌকায় ওঠার ভাসানো জেটির ওপর উঠে,

স্নানার্থীদের সামনে থেকে ছবি তুলছে। একসময় দেখলাম, ছোটখাট চেহারার, সম্ভবত চিনা মহিলা, ঐখানে নেমেগিয়ে প্রবল উৎসাহে ছবি তুলেই যাচ্ছে। ওদের দেখে আমিও নিচে নেমে কয়েকটা ছবি তুললাম।

বিকালের মত ভোরেও নদীতে অনেক নৌকা ঘুরছে। দূরে একটা নৌকার পিছন পিছন, কয়েকশ পাখীর একটা ঝাঁক উড়তে দেখে ছবি তোলার চেষ্টা করলাম। ঐ নৌকার কোন যাত্রী সম্ভবত পাখীগুলিকে কিছু খাওয়ার ছুড়ে দিচ্ছিল। পাখীগুলির নাম জানিনা। সাধারণভাবে যাদের সী-গাল বলা হয়, এগুলি সেরকমই। আমরা প্রায় ফেরার রাস্তা ধরার পর, দূরে বালুচরের ওপাড়ে গাছপালার মাথার উপর সূর্যোদয় হতে দেখলাম।



আমাদের হোটেলে ফিরেই আবার এলাহাবাদ রওনা দেওয়ার তাড়া ছিল, তাই সকালের স্নিগ্ধ গঙ্গাকে পিছনে রেখে, মুল্লীঘাটের সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলাম।

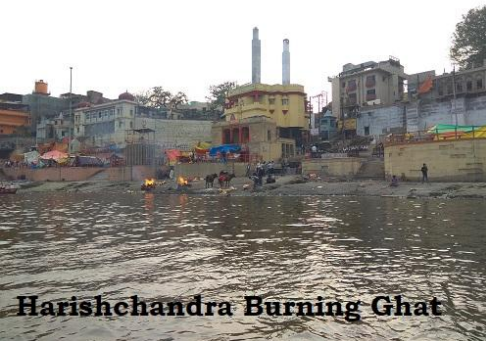
আগেরদিনই আমরা বিকেলে গঙ্গায় নৌকাভ্রমণ আর সন্ধ্যায় গঙ্গা আরতি দেখেছি। আগেই বলেছি, ঘাটের কাছে নতুন লোক দেখলেই, নৌকার দালাল এসে ঘুরঘুর করতে থাকে। ওরা চৌষটি ঘাট, চল্লিশ ঘাট ইত্যাদি নানান হিসেব বলবে। আমরা চৌষটিটা ঘাটই দেখব বলে, একটা দাঁড়টানা নৌকায় উঠলাম। তিনজনকে নিয়ে সবকটা ঘাট দেখাবে, চারশ টাকায়। একজনই মাঝি, সেই গাইড। হালের কোন ব্যাপার নেই। পড়ন্ত বিকেলে বারাণসীর গঙ্গায় ঘুরতে ঘুরতে আমার, হাসনাবাদের ইচ্ছামতিতে নৌকা করে ভাসান দেখার কথা মনে পড়ছিল। আমি যেবার ভাসান দেখতে গেছলাম, সেবার যেন ইচ্ছামতিতে ঢেউ আরও বেশী ছিল।



নৌকা থেকে ঘাটগুলি

নৌকার মাঝি তার মতো করে এক একটা ঘাটের নাম বলে, তার একটু ইতিহাস শোনাচ্ছিল। অনেক ঘাটেরই নাম পাথরে বড় বড় করে লেখা, মাঝি নদী থেকেই দেখাযায়। মাঝির জ্ঞানবুদ্ধি মত সে যা গল্প বলছিল, আমার কাছে বেশিরভাগই গ্রহনযোগ্য মনে হয়নি। যেমন তার বক্তব্য হল, দশাশ্বমেধ ঘাটে রাজা দশরথ দশবার অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। একজন রাজা তার জীবনকালে দশবার অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন,এ তথ্যটাই অবাস্তব। আমি যা জানি, এই ঘাটে স্নান করলে, দশবার অশ্বমেধ যজ্ঞ করার সমান পূণ্য হয়! বুঝতেই পারছেন,এ সব নিতান্তই প্রচলিত লোককথা।

তবে কিনা,মধ্য যুগের রানী অহল্যাবাই বেনারসের গঙ্গার পাড়েও একটা ঘাট বানিয়েছিলেন,এটা মেনে নেওয়া যায়। কিন্তু " কলকাতাকা রানী রাসমনি", ওখানে একটা ঘাট বানিয়েছিলেন, একথা কখনো পড়িনি। আর প্রখ্যাত হিন্দি সাহিত্যিকের নামে, "মুন্সীঘাট ", এটা ভাবলে মতে তৃপ্তি আসে; কিন্তু উনি নিজেই ঐ ঘাট বানিয়েছিলেন, এ বড় কষ্ট কল্পনা। মিনিট পনের নৌকা চলার পর পৌঁছলাম, হরিশ্চন্দ্র ঘাটের কাছে। গোটা দুই কাঠের চুল্লিতে দাহকাজ চলছে। ওপরে বৈদ্যুতিক চুল্লির চিমনিও দেখা যাচ্ছিল। একটা খাটুলিতে একটি মৃতদেহ নিয়ে তিনচার জন লোক হাঁটু জলে নেমে এল। খাটুলি সহ দেহটি গঙ্গায় একবার ডুবিয়ে ঘাটে তুলে নিয়ে গেল। খাটুলি বাহকদের একজন, মাথায় পাগড়ী শিখ দেখলাম। হরিশ্চন্দ্র ঘাটের কাছ থেকেই নৌকা ফেরার রাস্তা ধরল।



Harishchandra Burning Ghat

আবার উল্টোদিকে নৌকা চলতে শুরু করল। দশাশ্বমেধ ঘাট ছাড়িয়ে, গোটা চারেক ঘাটের পর মণিকর্নীকা ঘাট। নিচে, জলের কাছে তিনটি, আর দোতলায় দুটি কাঠের চিতা জ্বলছে।

মাঝি জানাল, মণিকর্নীকা ঘাটে বৈদ্যুতিক চুল্লি নেই। হরিশ্চন্দ্র আর মণিকর্নীকা দুই ঘাটেই কয়েটি করে গরু ঘুরতে দেখেছি। ওরা বোধহয় মৃতদেহের সাথে আসা ফুল খেতে আসে। পরদিন গাড়ী করে শহরের ভেতর দিয়ে যাওয়ার সময় একটি শবযাত্রীর দল দেখেছিলাম। ওরা গঙ্গার ঘাটের দিকে যাচ্ছে, এরকম কিছু বলায়, ড্রাইভার নিজেই জানাল, হরিশ্চন্দ্র ঘাটে যাচ্ছে। ওর মতে, হরিশ্চন্দ্র ঘাটই আসল জায়গা, মণিকর্নীকা পরে তৈরী, ওটা নিয়ে অকারণ মাতামাতি। মণিকর্নীকা থেকেই আবার দশাশ্বমেধ ঘাটের দিকে ফিরতে শুরু করলাম। আমার স্ত্রীর মনে হল, চৌষট্টিটা ঘাট তো দেখা হল না। মাঝি বেশ সপ্রতিভ ভাবে বলল, “আমি তো দাঁড় টানাতেই ব্যস্ত, গুনে দেখেছেন তো আপনারা!” বাস্তবে, আমাদের মাঝি, গোটা পনের ঘাটের নামই বলেছিল।

নামার সময় মাঝি নৌকা থেকেই ঘাটের গোটা দশেক সিঁড়ি ওপরে একটা কাঁচের বড় জানালা মত দেখাল। বলল, ওখানে বেনারসী শাড়ী তৈরী হয়। আমরা শাড়ী কিনব না, এটা ঠিক করাই ছিল। আর ঐ মাঝির যে কিছু দালালির ব্যাপার আছে, সেটা সবাই বোঝে। তবুও,যেহেতু সন্ধ্যার গঙ্গা আরতি শুরু হতে বেশ দেরী আছে, আমরা দোকানটা একবার ঘুরেই এলাম। ঘাটের ওপর একটা দোকানে চা খাওয়ার আগেই একজন মাঝি বয়সি মাঝি, নৌকায় বসে আরতি দেখার দরদাম বুঝিয়েছে। চা খেয়ে ঐ মাঝির ছোট ডিঙি নৌকায় উঠলাম।

দশাশ্বমেধ ঘাটের আরতি এখন দুভাগে ভাগ হয়েগেছে। একদিকে পাঁচজন আর একদিকে ন জন আরতি করে। আমাদের নৌকা, বেশ কসরত করে, ঠেলে ডাঙা থেকে কুড়ি ফুট মত দূরে, অসংখ্য ওরকম ছোট বড় নৌকার ভীড়ে, একটা জায়গায় রাখা হল। এখান থেকে দু দিকের আরতিই দেখা যায়। আমরা সন্ধ্যা ছটার আগেই নৌকায় বসে গেছিলাম। নৌকায় হাজার খানেক দর্শক আর ঘাটের ওপরেও হাজার দুই লোক। ছটা থেকে ঘাটের ওপর নানা রঙের আলো জ্বলে উঠল। বেশ একটা উৎসব উৎসব ব্যাপার। আমরা মোবাইল ক্যামেরা ইত্যাদি নিয়ে তৈরী, ভিডিও তোলার জন্য। নৌকা থেকে বাঁদিকের আরতির জায়গায় পাঁচজন জমকালো পোশাকের যুবক আরতি শুরু করল। মাইকে ভজন বাজছে, দুদিকে দু রকম। আরতি মোটামুটি ঐ ভজনের তালে হলেও, দুদিকে দুরকম গান বাজায়, গানের কথা বিশেষ কিছু বোঝা গেল না।

ডানদিকের দল আরতি শুরু করল মিনিট পাঁচেক দেরীতে। দু দিকেই, ওপরে ঝোলানো মাঝারি মাপের ঘন্টাগুলি লাগাতার একই ছন্দে বেশে গেল, ভক্তদের দড়ির টানে; পুরো এক ঘন্টা ধরেই। ডান দিকের আরতির সামনে, নদীতে গোটাচারেক বজরার মত বড় নৌকা, তার ছাদে বসার জন্য চেয়ার পাতা। আমাদের মাঝির হিসেবে,চেয়ারে বসার জন্য চারগুন বেশী খরচ। আরতি শুরুর আগে থেকে শেষ পর্যন্তই,চায়ের কেটলি ষ্টোভ ইত্যাদি নিয়ে, চার পাঁচ জন চাওলা, নৌকায় নৌকায় ঘুরে চা বিক্রী করেই গেল। তা করুক; এক ঘন্টা বসে বসে আরতি দেখে অনেকেই ক্লান্ত হয়ে পড়ছিল, একটু চা না হলে চলে! কিন্তু ঐ চাওলারা যখনই আমাদের ডিঙি নৌকায় লাফিয়ে পড়ছিল, নৌকা বিপজ্জনক ভাবে হলে যাচ্ছিল। আমাদের মাঝিও সমানে ঐসব চাওলাকে ধমক দিয়ে যাচ্ছিল। সাহস আছে বলতে হয় মাঝির ; এই দু হাজার উনিশ সালে বসে, চাওলাকে ধমকানো! দশাশ্বমেধ ঘাটের মাঝি বলে কথা,এও তো আর যে সে লোক নয়। আরতি শেষ হতেই মাঝি, দড়ি ধরে টেনে নৌকা পাড়ের কাছে আনল। আমরা এক এক করে নেমে ঘাটে উঠলাম।

সন্ধ্যার গঙ্গা আরতি আমরা হরিদ্বারে আর হৃষীকেশেও দেখেছি। হরিদ্বারের আরতী, গঙ্গার খালের অন্যপাড় থেকে, হরকি পৌড়ীতে বসে দেখেছি, ভালো লাগেনি। হৃষীকেশের ত্রিবেণী ঘাটের আরতি অনেক সংঘবদ্ধ। কিন্তু সেখানে গঙ্গায় জল খুব কম। তবে আমাদের মত, ভক্তিহীন ট্যুরিষ্টের কাছে, সবই সমান। ভ্রমণস্থানের হরেক মজার, এও এক রঙ্গ!



সারনাথের স্তুপ



Hardwar Ganga Aarati



Hrishikesh Ganga Aarati



Prayer at Sarnath

## বিশ্বনাথ মন্দির অ-দর্শন

দশাশ্বমেধ ঘাটে গঙ্গা আরতি শেষ হওয়ার পর আমরা বিশ্বখ্যাত বিশ্বনাথ মন্দির দেখার চেষ্টা করব, এরকমই ঠিক ছিল। সন্ধ্যায় কটা পর্যন্ত মন্দির খোলা থাকে, জানতে চাওয়ায়, মাঝি জানিয়েছিল, মন্দির তো খোলা থাকবে, কিন্তু আরতির পর সবাই মন্দিরের দিকে ছুটবে, তাই ওসময় ভীড় হবে। এই ভীড় আর দীর্ঘ লাইনের কথা চিন্তা করেই, কোথাও কোন মন্দিরেই প্রায় আমাদের পূজা দেওয়া হয় না। প্রসূনভাই ডিসেম্বরে ঘন্টা ছয়েক লাইনে দাঁড়িয়ে বিশ্বনাথ মন্দিরে পূজা দিয়েছে; এসব শুনেই, পূজা আমাদের ভ্রমণসূচি থেকে বাদ দেওয়াই ছিল।

আমাদের তাড়া কিছু ছিল না। আরতির পর, পাড়ে সিঁড়িতে যারা ছিল, আমরা পাড়ে ওঠার আগেই প্রায় নব্বই শতাংশ ওখান থেকে চলে গেছে। ঘাট থেকে রাস্তায় আসতে তাই খুব ভীড় ঠেলেতে হল না। দুপুরে ঐ রাস্তা দিয়ে আসার সময় দেখেছি, কলকাতায় পূজার সময় যেমন করে, রাস্তার একপাশ দিয়ে, শাল বল্পার বেড়া দিয়েছে। যারা পূজা দেবে, সম্ভবত গঙ্গায় স্নানের পর সোজা এসে ঐ বেড়ার ভেতর লাইনে দাঁড়িয়ে গেছে। একটা বড় চৌরাস্তার থেকে, দশাশ্বমেধ ঘাটের দিকে এগোলে, মাঝামাঝি জায়গায় একটা সিমেন্টের বড় গেট আছে মন্দিরে ঢোকানোর সিকিউরিটি চেক দেওয়ার জন্য। একটা দিয়ে ঢোকানোর অনুমতি ছিল না। পূজার ডালা হাতে লোকজন ঐ চৌরাস্তার দিকে এগোচ্ছিল। সন্ধ্যায় ওরকম কোন লাইন ছিল না। আমরা ঐ বড় গেট দিয়ে বাজারে ঢুকলাম।

যাবো তো মন্দির দেখার জন্য; তাহলে বাজারে ঢুকলাম কেন? আসলে ঐ বাজারের ভেতর দিয়েই মন্দিরে যাওয়ায় রাস্তা। শ্যামবাজার বা কলেজস্ট্রিট মার্কেটের ভেতর যেমন, দু দিকের দোকান পাটের মাঝে যেমন চার ফুটের মত রাস্তা থাকে, এও প্রায় তাই। নানান জিনিষের দোকান। কাপড় জামা, পান মশলা, মিঠাইয়ের দোকানের মাঝে মাঝে পূজার ডালা বিক্রীর দোকান।

সম্ভবত পৃথিবীর প্রাচীনতম মন্দির। শুনেছিলাম বিশ্বনাথের গলি বেশ সরু; কিন্তু সে যে এত সরু হয়ে যাবে, গলির শেষ পঞ্চাশ ফুটে না পৌঁছন পর্যন্তও বুঝিনি। প্রায় একশ গজ আগে থেকেই, ডালার দোকানে জুতো মোবাইল ইত্যাদি রেখে যেতে বলছিল। এক তো আমরা পূজা দিতে যাচ্ছি না; তাই ডালা কেনার প্রশ্নও নেই। অনেকেই উল্টোদিকের থেকে, জুতো পায়েই আসছে। তাই আমরা না থেমে এগিয়েই গেলাম। কিন্তু শেষ পঞ্চাশ ফুটের মত জায়গায় এসে বুঝলাম, আর জুতো পায়ে এগোনো যাবে না। একটা ডালার দোকানে দেখলাম, জুতো রাখা আর মোবাইল জমা করার লকারের ব্যবস্থা আছে। ওখানে জুতো মোবাইল রেখে, লকারের চাবি পকেটে নিলাম। কত টাকা দিতে হবে জানতে চাইলে, দোকানদার জনাল, ওর জন্য টাকা লাগবে না, ডালা নিলেই হবে। দুশো টাকা একটা ডালার চকচকে প্যাকেট নিয়ে ওখানেই লাইনে দাঁড়িয়ে গেলাম।

কলকাতার বিখ্যাত পূজা প্যাভিলনের ঢোকানোর লাইনের মত, একবার দাঁড়িয়ে গেলে আর ফেরার উপায় নেই। কিন্তু এখানে ফেরার রাস্তাও ঐ সাড়ে তিন ফুটের গলি। মাঝে মাঝে ঐ দুই লাইনের ভেতর দিয়ে, স্টেনগান কাঁখে পুলিশও এদিক ওদিক টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। সে সময় দুই লাইনের লোককে কাত হয়ে জায়গা দিতে হচ্ছে। মন্দিরে ঢোকানোর তিরিশ ফুট মত আগে, ভাল মত সিকিউরিটি চেক হল। একটা অতি প্রাচীন বাড়ীর দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকলাম। দশ ফুট মত যাওয়ার পর দেখি উল্টো দিকের থেকেও, আমাদের মত আর একটা লাইন আসছে।

মুখোমুখি দুই লাইনের একজন দুজন করে ডান দিকের দু ফুটের দরজা দিয়ে ঢুকতে থাকলাম। বোধহয় এক সেকেন্ডের জন্য একবার মুখ তুলে, মন্দিরের চেহারাটা দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম। দাঁড়ানোর কোন উপায়ও নেই। একটু সোনালি রঙের মন্দিরের চূড়াটা যেন এক ঝলক দেখতে পেলাম। একটা জায়গায় এসে লাইনটা যেন একটু ছড়ানোর জায়গা পেল। ডানদিকে, মেঝেতে চোকো মত খোপের ভেতর অনেক ফুল বেলপাতা দেখে, আমার স্ত্রী বোধহয় ভেবেছে, শিবলিঙ্গ ওখানেই আছে। দু একজন ঐ ফুল বেলপাতার স্তূপের ওপর আরও ফুল বেলপাতা চাপাচ্ছে দেখে, মেয়ের হাতে কটা ফুল বেলপাতা দিয়ে, ওখানে চাপাতে বলল। দু একজন, ডালার দোকানে কেনা, কাগজের কাপের দুধও ঐ ফুল বেলপাতার স্তূপের ওপর ঢালল। এত সহজে, এমন বিখ্যাত দেবতার মাথায় পূজা চাপানো যাবে, এটা আমি মানতে পারছিলাম না।

সেজন্যই বোধহয় লাইন ছেড়ে বের হইনি। ডানদিকে ঐ ফুল বেলপাতা ভরা চৌবাচ্চার দিকে এক ঝলক তাকিয়েই বাঁদিকে তাকালাম। ওদিকে একটা বড় জানালার মত দরজা আছে। দরজায় দুজন ধূতি শাট পরা লোক দাঁড়িয়ে, হাত থেকে ডালার প্যাকেটগুলি প্রায় কেড়ে কেড়ে নিচ্ছিল। ঐ ঘরের ভেতরও একটা, সম্ভবত রূপা বাঁধানো চৌবাচ্চা। চৌবাচ্চার ভেতর ফুল বেলপাতার স্তূপের ভেতরই বাবা বিশ্বনাথের অবস্থান, এটুকু বোঝার চেষ্টা করছি; এমন সময় দেখি ডান পাশ থেকে কেউ একজন আমার ডান হাত ধরে টানছে। আমাদের কলকাতার ভীড় বাস ট্রেনে চলার অভ্যাস। মুহূর্তের জন্য মনে হল, পকেটমার। যদিও পকেটে লকারের চাবি ছাড়া আর কিছুই ছিল না; তবুও হাতটা পকেটেই চেপে রইলাম। কে টানে হাত? বোঝার জন্য মুখ ফেরাতে দেখি আমার মতই সাধারণ প্যান্ট শাট পরা একটা লোক, হাত জোড় করে দেখিয়ে বলছে, হাত ঐ ভাবে রাখতে হবে। ঘোর সংসারী মনটাকে ভক্তির পথে ফেরানোর আগেই বুঝলাম, বাবার প্রবল ভক্তদের ঠেলায়, বাবার দরজা ছাড়িয়ে অনিচ্ছায় এগিয়ে গিয়েছি।

লোকটা হাত ধরে টানাটানি করার সময়ই একবার চোখে পড়েছে যে, দরজায় দাঁড়ানো একজন লোক, হয়তো বা পাভাই হবে, আমার স্ত্রীর হাত থেকে ডালার প্যাকেটটা নিয়ে সেকেন্ডের ভগ্নাংশ সময়ে, পাশ ফিরে, ঐ ফুল বেলপাতার স্তূপের দিকে হাতটা বাড়িয়েই ফেরৎ এনে, আমার স্ত্রীর হাতে ধরিয়ে দিয়ে, দক্ষিণার জন্য হাত পেতেছে। এদিকে আমার স্ত্রীর হাতে যে পাঁচ বা দশ টাকার কয়েনটি ছিল, সেটিকে ও সামনেই একটা দানবাক্স দেখে তার মধ্যেই ফেলে দিয়েছে। ওর এই কাণ্ড দেখে পাভা মশাই তো একেবারে চমকে উঠেছে। এমন অদ্ভুত ভক্ত সচরাচর তো ওরাও দেখে না। বাবার দরজার সামনে থেকে চার পাঁচ ফুট এগিয়ে আসার পর, আমার স্ত্রী জানতে চাইল, বাবা বিশ্বনাথের অবস্থানটা কোথায়? আসলে ওর ঐ হাত থেকে ডালার প্যাকেটটা ছিনতাই হয়ে, যেভাবে মুহূর্তের ভেতরই প্রসাদ হয়ে ফিরে এসেছে, সেই ম্যাজিকটা বুঝতেই ওর ঐ সময়টা চলে গেছে; বাবার রূপা বাঁধানো চৌবাচ্চা বা ফুল বেলপাতার স্তূপের দিকেই ওর চোখ যায়নি।

সত্যি বলতে কি, এসব বিখ্যাত মন্দিরে পূজা দেওয়ার জন্য লোকে ছ ঘন্টা সাত ঘন্টা লাইন দিয়ে, কখনো কয়েকশো টাকার টিকিট কেটে তবেই পৌছয়। এত কম পরিশ্রমে, এত কম সময় নষ্ট করে, বাবার দর্শন হয়ে গেল; এসব বাবারই ঘোর অপছন্দের। থাক বাবা তাঁর মহিমা নিয়ে। আমরা ঘোর ভক্তিহীণ ট্যুরিস্ট, বাবার মন্দিরের থেকে বেরিয়ে আসার পথে, কোনরকম ছড়োছড়ি ছাড়াই, মা অন্তর্পূর্ণার মন্দির দর্শন করে ধন্য হলাম।

ডালার দোকানে ফিরে, লকার খুলে মোবাইলগুলি নিলাম। জুতা পরে ফেরার পথ ধরলাম। ঐ বাজারের গলিতেই একটা দোকানে রাবড়ি বিক্রী হচ্ছে দেখে দাঁড়ালাম। বেনারসের রাবড়ি না খেলে নাকি জীবনটাই বৃথা। ঠিক আছে, চল্লিশ টাকা দিয়ে একশ গ্রাম রাবড়ি কিনে, তিনজনে ভাগ করে খেয়ে জীবন ধন্য করলাম। ফেরার পথে, আমাদের হোটেলের কাছেই একটা ট্র্যাভেল এজেন্টের দোকানে, পরদিন সকালে এলাহাবাদ যাওয়ার জন্য একটা গাড়ী ঠিক করে হোটেলে ফিরলাম।

## আমার কুম্ভ মেলা দর্শন

এবার বারানসী বেড়ানোর পরিকল্পনা করার সময় একবারও মাথায় আসেনি যে ঐ সময় কুম্ভ মেলাও চলবে। সত্যি বলতে কি, কুম্ভ মেলা সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র আগ্রহ আমাদের ছিল না। আমাদের বেড়ানোর পরিকল্পনা সব সময়ই ছেলে মেয়ের পরীক্ষার তারিখ ইত্যাদি দেখেই করা হয়। এবারও তিন সাড়ে তিন মাস আগে, ট্রেনের টিকিট কাটা। অতো আগে, মেলার দিন ক্ষণ জানার কোন চেষ্টাও করিনি। আর আমাদের এবারের বেড়ানোর পরিকল্পনা ঐ বারানসী আর তার আশেপাশের জায়গায় যে ট্রেনে যাচ্ছি, ওটাই যে আর দু ঘন্টা বসে থাকলে, একেবারে কুম্ভ মেলায় পৌঁছে দেবে, এটা ভাবার কোন প্রশ্নই ছিল না।

আমার বন্ধুদের ভেতর গোস্বামীবাবুর মত ভ্রমণপাগল লোকও আছেন। কিন্তু বারানসীর মত অতি বিখ্যাত জায়গায় যাওয়ায় আগে ওনাকে জিজ্ঞেস করে, ওনাকে বিরক্ত করতে চাইনি। একেবারে হাওড়া স্টেশনে ট্রেনে বসে মনে হল, গোস্বামীবাবুকে একটা বার্তা পাঠিয়ে রাখি। বার্তা পেয়েই উনি উত্তরে লিখলেন, এলাহাবাদটাও একদিন ঘুরে আসুন। এবার আর ওটা হবে না, জানানানোর পরই উনি হিসেব করে দেখিয়ে দিলেন, আমার ঐ দু রাত তিন দিনের ভেতরেই বারানসী, তার আশেপাশের কয়েকটা জায়গায় ঘুরেও, একদিন এলাহাবাদটাও দেখে আসতে পারি। তবুও খুব একটা উৎসাহ দেখলাম না। তখনই, সম্ভবত আমার আগ্রহ বাড়তে, উনি জানালেন যে, কুম্ভ মেলা এখনও চলছে।

অবশ্য কুম্ভ মেলায় যাওয়ার সাহস হয়নি কোনদিন। শুধু মাত্র ভীড়ের ভয়েই, ওসব মেলা ইত্যাদি আমরা এড়িয়ে চলি। তবুও এবার কেমন যেন মনে হল, গোস্বামীবাবু এত উৎসাহ দিচ্ছেন, খোঁজখবর নেওয়াই যায়। পরদিন সকালে ট্রেনে বসেই, মোবাইলের নেট ঘাঁটাঘাঁটি করতে শুরু করলাম। একটা সংস্থা, মাথাপিছু মাত্র সাড়ে সাতশো টাকায় বেনারসের থেকে এলাহাবাদ নিয়ে গিয়ে আবার ফিরিয়ে আনবে। খুব উৎসাহ পেলাম। কিন্তু ওদের ফোন করলে জানাল যে, ওটা এখন আর চালু নেই। স্টেশনের থেকে অটো নিয়ে আমাদের হোটেলের যাওয়ার সময় প্রায় এক কিমি দূরে নামিয়েছিল। বাকীটা হাঁটার সময় দু একটা গাড়ী ভাড়ার দোকান চোখে পড়েছে। কিন্তু সন্ধ্যায় মন্দির থেকে হোটেলের ফেরার রাস্তায় ঐ একটাই দোকান দেখলাম। একজন মাঝ বয়সি লোক একাই চুপচাপ বসে ছিলেন। এলাহাবাদ গিয়ে ফিরে আসার গাড়ীর কথা বলতেই বুঝলাম, ওটা ওখানে বেশ চালু ব্যাপার। মোটামুটি পাঁচ হাজারের মত লাগতে পারে, এমন একটা ধারণা গোস্বামীবাবুর সাথে আলোচনা করে বুঝেছিলাম। এখন তাই সাড়ে তিন হাজার টাকা বলায়, একেবারেই রাজী হয়ে গেলাম। এক হাজার টাকা অগ্রিম দিয়ে, সকালে কোথা থেকে গাড়ীতে উঠব জেনে হোটেলের ফিরলাম।

ট্রাভেল এজেন্ট ভদ্রলোকের একটা কথা আমাদের একটু চিন্তায় রাখল। গাড়ী এলাহাবাদ শহরে নাও ঢুকতে দিতে পারে। সেক্ষেত্রে টোটো বা অটো করে সঙ্গম পর্যন্ত যেতে হবে। উনি আমাদের সকাল ছটাতেই রওনা হতে বলেছিলেন; কিন্তু আমরা স্নান করে, আটটা নাগাত বেরতে চাই জানালাম। যদিও উনি মুখে কিছুই বলেননি, ওনার মুখ দেখে আমার মনে হল, বেশ অবাকই হয়েছেন। আসলে এমন বিচিত্র লোকজন তো সহসা দেখাও যায় না। বাড়ীতে খেয়েদেয়ে নিমন্ত্রণ বাড়ীতে যাব বললে যেমন হয় আর কি!

যাচ্ছি কুম্ভমেলায়, প্রয়াগের সঙ্গমে ডুব দেওয়ার জন্যই তো কোটি কোটি মানুষ, আসমুদ্রহিমচল থেকে জীবন বাজী রেখে দৌড়ে আসছে, মাস দেড়েক ধরে। অবশ্য নিজেদের আকাট না ভেবে একটু উকিলের যুক্তিতে, নিজেদের বড় ভক্তও ভাবতে পারি। বলাতো যায় না, উনি হয়তো ভাবলেন, এরা সকালে বারানসীর গঙ্গায় পূণ্যস্নান করে দুপুরে প্রয়াগে ডুব দেওয়ার মানত করে এসেছে।

কথামত পরদিন সকালে আটটার দশ মিনিট আগেই ঐ ভদ্রলোককে ফোন করে জানালাম যে আমরা বেরছি। উনিও ঠিক সময়েই দোকানের সামনে এসে অপেক্ষা করতে থাকলেন। আমাদের হোটেল থেকে বেরনোর সময় একটা ছোটখাট নাটকে মিনিট পনের দেবী হয়ে গেল। কারনটা প্রায় হাস্যকর, কিন্তু আমার মেয়ের জেদের জন্য, ভাষা দিবসের পরের দিন সকালেই, এমন একটি বিচিত্র অভিজ্ঞতায় বুঝেছি, ভাষা নিয়ে মাতামাতি করার কিছু নেই।

আমাদের হোটেলের বুকিং ছিল একটা লাঞ্চ আর একটা ব্রেকফাস্ট সহ। কিন্তু হোটেলের একটাই মাত্র কর্মচারি ছেলেটি বলছিল যে, সাড়ে আটটার আগে ওদের রান্নার লোক আসে না। তাই আটটায় ব্রেকফাস্ট দিতে পারবে না। আমার মেয়ে ছেলেটিকে ধমক দিয়ে বলেছে, দরকার হলে বাইরের দোকান থেকে খাওয়ার কিনে আনতে হবে। আমরা আটটার মিনিট পাঁচেক আগে নেমে দেখি, হোটেলের গেট বাইরে থেকে তালা দেওয়া। রিসেপসনে এক চিনা ভদ্রলোক বসে ফোনে কথা বলছে। শুধুমাত্র " উশী, উশী " ছাড়া আর কোন কথাই বুঝতে পারছিলাম না। আমরা বেশ বুঝতে পারছিলাম, হোটেলের ছেলেটি বাইরে থেকে আমাদের জন্য খাওয়ার আনতে গিয়েছে। হঠাৎ দেখি ঐ চিনা ভদ্রলোক রিসেপসনের ল্যান্ড ফোনের রিসিভার এক হাতে, আর অন্য হাতে ফোনের বাস্ফট নিয়ে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে আমাদের ডাকছে; বার বারই বলেছে, " ফ্ফেলিং, ফ্ফেলিং"!

আমি ফোনটা ধরে, হ্যালো বলায়, ওদিক থেকে একজন লোক বলল, সে হোটেলের মালিক। আমি ভারতীয় কি না জেনে, ইংরেজীতেই জানতে চাইল, হোটেলের কর্মচারি কাউকে দেখছি কি না। ওরা কেউ নেই, হোটেলের মেইন গেট তালা দেওয়া ; আমরাও হোটেল ছেড়ে বেরনোর জন্যে অপেক্ষা করছি জানলাম। ফোন ছাড়ার পর, চিনা ভদ্রলোক জানতে চাইলেন, ব্যাপারটা কি! আমি ইংরেজী ভাষায় বোঝানোর চেষ্টা করে দেখলাম, কিছুই বুঝছেন না। আমি ইংরেজী ভাষায় বলছি কি না বোঝার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করে, পকেট থেকে মোবাইল বের করলেন। সম্ভবত, মোবাইলের অনুবাদক সফটওয়্যার চালিয়ে, আমাকে লিখতে বললেন। কি বোর্ড দেখিয়ে বললেন, " এ বি চি!"

আমি ইংরেজী ভাষায় ওনার মোবাইলে লিখলাম, আমরাও হোটেল ছেড়ে বেরনোর জন্যে অপেক্ষা করছি। হোটেলের ছেলেটি বাইরে আছে। সাথে সাথে প্রতিটা শব্দ, চিনা ভাষায় মোবাইলের স্ক্রিনে ফুটে উঠছে দেখলাম। এর মধ্যে হোটেলের ছেলেটির মোবাইলে একটা ফোন আসায় বুঝলাম, সে মোবাইলটাও রিসেপসনের টেবিলে রেখে গেছে। চিনা ভদ্রলোক আমাকে পাখির মত ডানা মেলে ওড়ার ভঙ্গি করে বোঝালেন, ওনার প্লেনের সময় হয়ে আসছে। কটায় ফ্লাইট জানতে চাওয়ায়, আঙুল তুলে জানালেন, নটায়।

এর মধ্যে আরও একটি পরিবার ব্যাগপত্র নিয়ে নিচে নেমে এসেছে। আমাদের ট্রাভেল এজেন্ট ভদ্রলোকের ফোনও এর মধ্যে এসেছে। উনিও আমাদের এত দেরী দেখে চিন্তায় পড়েছেন। ওনাকে ব্যাপারটা বোঝাতে বোঝাতেই, হোটেলের ছেলেটি সাইকেল চালিয়ে এসে গেল। ওকে কলাস্পেল গেটের বাইরে দেখেই চিনা ভদ্রলোক দৌড়ে গেছেন। হৈ হৈ করে কি বলছেন, বোঝার কোন উপায় নেই। ছেলেটি হস্তদস্ত হয়ে রিসেপসনের দিকে চলল। হাতের খাবারের প্যাকেট দুটি সামনের টেবিলে রেখেই, হোটেলের বড় খাটাটা বের করে দিল,সই করার জন্য। এই দেড় দুই সেকেন্ডের ভেতরই, চিনা ভদ্রলোক মুকাভিনয় করে ওকে বুঝিয়েছেন, উনি প্লেন ধরার জন্যে দৌড়ছেন; ঘুসি পাকিয়ে ওকে দেখিয়ে বোঝালেন, খুব রেগে গেছেন।

আমরাও ঐ পুরি আলুর তরকারির প্যাকেট তুলে নিয়ে রওনা দিলাম। খাতায় সই করার সময়ই শুনলাম, ছেলেটি ওর মালিককে ফোনে জানাচ্ছে যে, ওর আর এক সহকর্মী হঠাৎই অনুপস্থিত হয়েছে। আমরা তস্য গলি থেকে বড় গলিতে নেমে দেখলাম, ঐ চিনা ভদ্রলোক উল্টোদিকে তাকিয়ে প্রবল বেগে সিগারেট টানছেন। তখন সোয়া আটটা বাজে; কি করে বত্রিশ কি মি দূরের বেনারস এয়ারপোর্টে নটায় পৌঁছতে পারবেন বুঝলাম না।

আমাদের ট্রাভেল এজেন্ট ভদ্রলোকের দোকানটা ছাড়িয়ে চলে যাচ্ছিলাম। উনি উল্টোদিকের একটা বাড়ীর পৈঠায় বসে ছিলেন। আমার স্ত্রী আর মেয়েকে দেখে চিনতে পেরে হৈ হৈ করে উঠলেন। তখনও একটা দুটো করে দোকানপাট খুলছে। অন্য একজন দোকানদারই সম্ভবত, আমরা গলি ছাড়িয়ে চলে যাচ্ছিলাম বুঝে একটু রসিকতাও করলেন," ইয়ে বেণারসকা গলি!" আমরা ট্রাভেল এজেন্ট ভদ্রলোকের পিছন পিছন চললাম বড় রাস্তায় গাড়ী যেকদিকে রাখা আছে সেদিকে। প্রায় আধ কিমি হাঁটলাম। আর সতিই বুঝলাম," বেনারসকা গলি" কী বস্তু।

একটা বড় রাস্তার ওপর আমাদের জন্যে গাড়ী দাঁড়িয়ে ছিল। পরের দিনের জন্যে গাড়ীর ব্যবস্থা করে আমরা চললাম, অমৃত কুন্ডের সন্ধানে।

সেই ১৯৮৮ সাল থেকেই শুনে আসছি, কুন্ড। কোনদিনই ঐ অমৃতের লোভ আমার ছিল না। সমরেশ বাবু, নবনীতা দেবসেন মহাশয়া আর হালের ভাস্কর বাবুর লেখা ; সব লেখকই মেলায় সারা ভারতের বিচিত্র মানুষ দেখার উপরেই জোর দিয়েছেন। পুণ্যালোভাতুর ভারতের আম জনতার একটা আভাস দশাশ্বমেধ ঘাটেই পেয়েছি। এমন কি নাজা সাধুদের আর রঙ্গসন্ধানী বিদেশিনীদেরও দেখা পেয়েছি ঐ দশাশ্বমেধ ঘাটেই। তবুও প্রয়াগরাজে কুন্ডের মাঝেই গিয়ে হাজির হব, এমনটাতো বাড়ী থেকে বেরনোর সময়ও ভাবিনি।

এ গাড়ীর ড্রাইভার বেশ চালাক চতুর লোক। কথায় কথায় জানলাম, এবারই কুন্ড মেলা উপলক্ষে, অন্তত পঁচিশবার বেনারস থেকে এলাহাবাদে এসেছে। কত সময় লাগবে জানতে চাওয়ায়, সব ড্রাইভার যেমন একটু টেনে বলে, এও সেভাবেই বলল, রাস্তায় ট্রাফিক জ্যামে না পড়লে তিন ঘন্টা লাগবে। এরও সেই বক্তব্য, বেশ সকালে বেরতে পারলে, ভীড় ইত্যাদির আগেই যাওয়া যেত। শহরে ঢোকা যাবে কি না, বা শাস্ত্রী ব্রীজের উপর দিয়ে যাওয়া যাবে কিনা, সবই নির্ভর করছে ওখানে গিয়ে কেমন ভীড়ের মধ্যে পড়ি, তার উপর।

একশ কুড়ি কিমি রাস্তার অর্ধেক মত চওড়া হাইওয়ে ; অনেকটাই এদিক ওদিক ঘুরিয়ে নিয়ে গেল। মাঝে তেমন বড় শহর আর নেই। গোটা তিন চার গঞ্জের মত পড়ল। রাস্তার দুপাশে গম আর সর্সের ক্ষেত। এক ঘন্টা চলার পর, রাস্তার পাশের একটা সাধারণ চায়ের দোকানে বসে চা খেলাম। আর আমাদের যুদ্ধ করে আনা, পুরি আলুর তরকারি।

এলাহাবাদ শহরে ঢোকান মাইল চারেক আগে একটা জায়গায়, ডানদিকে ফাঁকা মাঠের ভেতর কয়েকটা বাস দাঁড়িয়ে আছে, দেখাল আমাদের গাড়ীর ড্রাইভার। মেলার ভীড়ের সময় এখানেই সব গাড়ীকে থেমে যেতে হয়েছে। বেশকিছু নতুন হলুদ রঙের বাস, এখান থেকে যাত্রীদের নিয়ে মেলায় ঢুকিয়েছে। ড্রাইভার বেশ ভক্তিবরে ওদের মুখ্যমন্ত্রীর নাম উল্লেখ করে জানাল যে, উনি পূণ্যার্থীদের জন্যে বিনা পয়সায় এসব ব্যবস্থা করেছেন। এটাও জানাল যে, তবুও হাজার হাজার মানুষ রাস্তা ধরে হেঁটে মেলায় গিয়েছে। আমরা হাঁটার লোক একজনও দেখিনি; তবে ওরকম হলুদ বাস দু চারটে দেখেছি রাস্তায়।

সব জেলা শহরে যেমন হয়, এলাহাবাদেও তেমন, শহরে ঢোকান দু তিন কিমি আগে থেকেই রাস্তায় গাড়ীর গতি ক্রমশ কমতে শুরু করল। আমাদের ড্রাইভার একটা জায়গায় বাম দিকে নামার চেষ্টায় বড় রাস্তা থেকে সরে এল। কিন্তু ওখানে একেবারে বন্দুকধারী পুলিশ, ট্রাফিক পুলিশের কাজ করছে। ওরা জানাল একটু আগে বাঁদিকে নামা যেত; এখন আর কিছু করার নেই, সামনে এগিয়ে গাড়ী ঘুরিয়ে আনতে হবে। এবার ড্রাইভার সোজা গাড়ী চালিয়ে শাস্ত্রী ব্রীজের উপর দিয়ে চলল।

এই সেই গোস্বামীবাবুর প্রিয় শাস্ত্রী ব্রীজ। উনি ব্রীজে দাঁড়িয়ে নিচের মেলা দেখতে বলেছিলেন। এই ব্রীজে গাড়ী দাঁড়ানো অসম্ভব। চলন্ত গাড়ীর জানালা দিয়ে নিচের মেলার ছবি তোলার চেষ্টা করলাম, সুবিধা হল না। দু দিকেই যতোদূর চোখ যায়, শুধুই তাঁবু আর তাঁবু। দিনের আলোতে বিশেষ দর্শনীয় মনে হল না। তবে রাতে যখন হাজার হাজার আলো জ্বলবে, নিশ্চয়ই সুন্দর লাগবে।

গাড়ী ব্রীজ পেরিয়ে বাঁদিকের রাস্তায় চলল। এপাড়ে রাস্তায় জ্যাম ক্রমশ বাড়ছে। রাস্তার বাঁদিকে সেই তাঁবু ভর্তি মাঠ।

এই রাস্তার পাশে কিছু লোকজনকে দেখে মনে হল, স্নান করে ফিরছে। ব্রীজ থেকে আধ কিমি মত এগিয়ে একটা ফ্লাই ওভারের তলাদিয়ে গাড়ী ডানদিকে ঘুরে ফেরার রাস্তা ধরল। আবার প্রায় এক কিমি ওরকম জ্যাম রাস্তায় চলে, গাড়ী ডানদিকে নেমে গেল বড় রাস্তা থেকে। একেবারে নদীর কাছে এসে বোঝা গেল, এ রাস্তায় গাড়ী আসছে উল্টোদিকের থেকে। এ রাস্তাটা একটা সরু ভাসানো পুলের দিক থেকে আসছে। অগত্যা গাড়ী ঘুরিয়ে আবার বড় রাস্তায় উঠতে হল।

পরের ভাসানো পুলের ওপর দিয়ে আমাদের গাড়ী আবার গঙ্গা পেরিয়ে পুবপাড়ে এল। ডাইনে বাঁয়ে ওরকম ভাসানো পুলের সংখ্যা দশ বারোটা বোধহয়। বড় বড় ড্রামের ওপর পুরু রবারের চাদর ফেলে তৈরী এই পুলগুলী। মেলার ভেতর প্রায় সব রাস্তাই বালির ওপর ওরকম রবারের চাদর ফেলে তৈরী। সমস্ত রাস্তা জল ছিটিয়ে ভেজানো, কোথাও ধুলো উড়তে দেখিনি। পুলের ওপর দিয়ে গাড়ী চলার সময়ই দেখেছি, দুপাড়ের বালুচরে যতোদূর চোখ যায়, মেলার তাঁবু। পুবপাড়ে, শাস্ত্রী ব্রীজের উত্তরে, অনেকদূর পর্যন্ত নদীর জলের কয়েক ফুট দূরে, অনেকগুলি টিনের খোপ খোপ করা। ওগুলী স্নানের পর পোষাক পাল্টানোর ঘর। আমরা পুবপাড়ে এসে আবার ডানদিকে চললাম। শাস্ত্রী ব্রীজের তলা দিয়ে অন্তত দু কিমি মত দক্ষিণদিকে এগিয়ে গেলাম।

গাড়ীকরে চলতে চলতেই দেখতে পেলাম অসংখ্য তাঁবুর সারি। লোকজন প্রায় নেই। রাস্তার পাশে একেকটা আখড়ার বড় বড় গেট। গেটে বড় বড় হিন্দী হরফে আখড়ার নাম আর প্রধান বা এ জাতীয় কোন সাধু মহারাজের ছবি। গেটের পিছনে বিরাট বিরাট ম্যারাপ বাঁধা। আমাদের পরিচিত গেরুয়া গোষ্ঠীর একটা ম্যারাপও চোখে পড়ল। বেশ কয়েকটি লরীতে, প্যাডালের খোলা বাঁশ কাঠ বোঝাই হচ্ছে দেখলাম। রাস্তার একেবারে পাশে, কয়েকটা খোলা তাঁবুর জায়গায়, খড় বিচালি ছড়ানো। একটা জায়গায় পর পর দমকলের আপিস আর থানা দেখলাম। করুগেটেড টিনের তৈরী এ সব আপিসে লোকজন বিশেষ চোখে পড়ল না।

এ বিচালি দেখে একটা ভয়ের কথা মাথায় এল। কুস্ত মেলায় তো দেশের যত বিখ্যাত গাঁজাখোরের জমায়েৎ হয়। তাছাড়াও বেণারসেই দেখে এলাম, নাস্তা বাবাদের আখড়ার কাঠের আঙুনও সব সময় জ্বলছেই। এ সব আখড়ার মেঝেতেও কি খড় বিচালি পাতা থাকে?

দু চারটে রাস্তা দিয়ে নদীর দিকে যাওয়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে, শেষে একটা বড় হাতির মাথাওলা গেট দিয়ে নদীর দিকে যাওয়ার রাস্তা পেল। গাড়ী একেবারে নদীর জল থেকে তিরিশ ফুট মত দূরে গিয়ে থামল। আরও এগোন যেত; কিন্তু গোটা মাঠটা কাদা হয়ে থাকায় আমাদের গাড়ী আর এগোল না। শেষ প্রায় একশ গজ জায়গায় কোন তাঁবুর ব্যবস্থা ছিল না, বোঝা যায়। আমরা হেঁটে একেবারে জলের কাছে চলে গেলাম। তখন একেবারে ভর দুপুর, ছাতা ছাড়া দাঁড়ানোর উপায় নেই। আমার গায়ে একটা শীতের জামা ছিল ; গরমে একেবারে যেমে গেছলাম। টলটলে পরিষ্কার নদীর জল দেখে স্নান করার ইচ্ছা হল। এপাড়ে দু চারজন করে লোকই স্নান করতে নামছে। ওপাড়ে লোক পিলপিল করছে। এদিকে পাড়ের থেকে পনের কুড়ি ফুট দূরদিয়ে, প্লাস্টিকের ভাসানো বাক্সের বেড়া চলে গেছে, ডানদিক বাঁদিকে যতদূর চোখ যায়।

ওপাড়ের কাছে, জলের উপর এক ঝাঁক কালো পাখি বসে আছে। এতদূর থেকে চেনার কোন উপায় নেই। চেহারা কিন্তু শকুনের থেকেও বড়। ওরা ছাড়াও বেশ কিছু সাদা পাখিও ওদের কাছে বসছে আর উড়ছে। এই সাদা পাখি বেণারসেই অনেক দেখে এসেছি। আমার মেয়ে ক্যামেরায় যে ছবি তুলেছিল, বাড়ী এসে সেগুলিই বড় করে বোঝা গেল, ঐ বড় পাখীগুলি একরকম বড় পানকৌড়ি। আর ওরা নদীর বুকে চড়ায় বসে ছিল।

আমি গাড়ী থেকে গামছা এনে, নদীতে নেমে স্নান করলাম। পূণ্য কিছু হল কি না জানিনা ; প্যাচপেচে গরমের থেকে শরীর আরাম পেল। ঐ প্লাস্টিকের ভাসানো বাক্সের বেড়ার ওপাশে কয়েকটা মাছ ধরার নৌকার মত দেশী নৌকা বাঁধা ছিল। ওদের কাছে জানতে চাইলাম, সঙ্গমে নিয়ে যায় কিনা। আমার সহকর্মী, ডাক্তার দাস সেরকমই বলেছিলেন। ওরা জানাল, ঐ দিন, ওপাড়ে কোন মন্ত্রী বা ওরকম কেউ আসায় নৌকা বিহার হবে না। আমি স্নান করে উঠে ওখানেই পোষাক পাল্টে, গামছা রোদে মিললাম। দুটি একটি করে গাড়ীতে আমাদের মত দু চারজন করে যাত্রী আসছে যাচ্ছে। কেউ কেউ স্নান করছে। পাড়ে যথেষ্ট পুলিশ আর অন্যান্য কর্মচারি আর স্বেচ্ছাসেবক ও ইতস্ততঃ অলস ভাবে ঘুরছে। মহিলাদের পোষাক পাল্টে নেওয়ার জন্য একরকমের চার দেওয়ালের তাঁবুর মত নিয়ে, কিছু মহিলা স্বেচ্ছাসেবক কসরত করে যাচ্ছে। এক আধজন মহিলা স্নান সেরে ঐ খোপে ঢুকেও যাচ্ছে।

জলের কাছে, পাড়ের উপর একজন মহিলা, চরের মাটির উপরেই পূজার সরঞ্জাম নিয়ে দোকান বসিয়েছে। নারকেল, ধুপ, সিন্দুরের প্যাকেট ইত্যাদি এছাড়া আর দোকানপাট কিছু নেই। গাড়ীর কাছে ফিরে এসে একজন আইসক্রীম বিক্রেতাকে পেলাম। আইসক্রীম কিনে খেতে শুরু করতেই, একজন ভিখারিনী এসে হাত পাতলা আইসক্রীম খেতে চায় কিনা জেনে, ওকেও একটা দিতে বললাম। তীর্থক্ষেত্রে ভিখারি বলতে ঐ একজনই দুটি ছেলেকে দেখেছি, স্নানের জায়গায় বারবারই ডুব দিয়ে, পয়সা তুলে আনছে। বাইশ না বত্রিশ কোটি লোক এবার কুম্ভে স্নান করেছে; তাদের পাঁচ শতাংশও যদি গঙ্গায় টাকা পয়সা ছুড়েছে, কত কোটি টাকা ঐ প্রয়াগের গঙ্গায় ডুবে আছে, তাই ভাবছি।

আমার গামছা মিনিট দশেক রোদ পেয়েই শুকিয়ে গেল। তারপরই ফেরার রাস্তা ধরলাম। ফেরার পথে, বালুচরের উপর সারি সারি বায়ো টয়লেট দেখে আন্দাজ করতে পারলাম, আজকের ঐ খু খু প্রান্তরে কদিন আগেই, লক্ষ লক্ষ লোকের সমাগম হয়েছিল।

ড্রাইভার যে রাস্তা দিয়ে মেলায় ঢুকতে গিয়ে বাধা পেয়েছিল, সেই রাস্তা ধরে বেনারসের বড় রাস্তায় উঠে এলাম। গোস্বামীবাবু বলছিলেন, এলাহাবাদের মিউজিয়ামটা দেখে নিতো ড্রাইভার দেখলাম, ঐ মিজোরামের ব্যাপারে বেশ বিতর্কিত আমাকে নিরুৎসাহিত করার জন্য নাক কুঁচকে বলল, ওখানে আছে তো একটা নেতার কিছু জামা কাপড় ; যেমন জামা প্যান্ট আপনি পরে আছেন, তার সাথে কোন পার্থক্যই নেই। তারজন্য ঐ জ্যাম রাস্তায় ফিরে যাওয়া অনর্থক। ওর রাজনৈতিক মতাদর্শের জন্যই সম্ভবত ওর ঐ অবজ্ঞা ঠিকই তো, অমৃত কুম্ভের সন্ধানে এসে কেউ, রাজনৈতিক নেতার পোশাকের প্রদর্শনশালা দর্শন করতে যাবেই বা কেন?

ভাঙা হলেও, কুম্ভ দর্শনতো হল। স্নানের পর গামছা রোদে দিয়ে অপেক্ষা করার সময় দেখেছি, আট দশজন মেরুন রঙের ইউনিফর্ম পরা লোক এসে, কোরাসে গান গেয়ে গেল। নিতান্তই অনিচ্ছা সত্ত্বেও গানের দু চারটে শব্দ কানে এল। গান্ধীজীর স্বপ্ন পূরণ করা..... ঐ রকম কিছু কথা। এটুকু মনে আছে, মেয়েকে বলেছিলাম, এরা সব সাফাইকর্মী, এদের গানে, ঐসব " স্বচ্ছ ভারত " জাতীয় কিছু বক্তব্য আছে। বাড়ী ফিরেই, টি ভিতে দেখলাম, ওদের নিয়েও, রাজনীতির বাজার বেশ গরম করা হচ্ছে। আমরা ভেতো বাঙালী পর্যটক। ফেরার পথে, হাইওয়ের পাশে একটা ধাবায় খেতে গিয়ে, মাছ ভাত পেয়ে পুলকিত হয়েছি। ঐ মেরুন পোশাকের লোকগুলির সাথে একটা সেক্ষি তুলে আনলেও বেশ আত্মপ্রাণী অনুভব করা যেত। আসলে কুম্ভের পূণ্যভূমিতে দাঁড়িয়ে কোন ভদ্রমণী করার কথা মনেও আসেনি। এটাই তো কুম্ভ স্নানের পরম প্রাপ্তি।

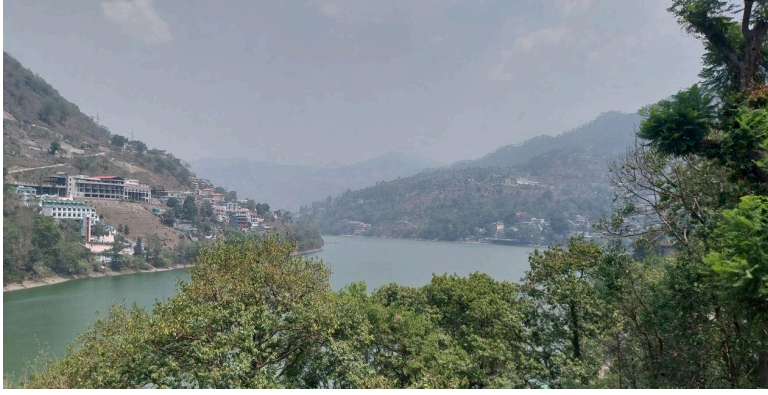
নৈনিতাল-এর দিকে ২০২৪

নৈনিতাল এর কথা ছোটবেলা থেকে শুনেছি। কিন্তু এতদিন যাওয়া হয়নি। এছাড়া রানীক্ষেত, আলমোড়া, এত নাম শোনা। চাকরী থেকে অবসরের পর, অন্তত দেশের মধ্যে যে সকল ভ্রমণস্থান এর নাম খুব শোনা যায়, সেগুলি ঘোরার ইচ্ছা আছে। মার্চের মাঝামাঝি উত্তরাখন্ড রাজ্যের নৈনিতাল আর তার আশপাশের কয়েকটি জায়গা ঘোরার জন্য, ট্রেনের টিকিট কেটে রাখলাম। কলকাতায় জুনের মাঝামাঝি পর্যন্ত বেশ গরম থাকে। ঐ সময় নৈনিতালের এদিকে বর্ষা নামে কি না জানা নেই। এখন যে কোন জায়গায় বেড়াতে যাওয়ার আগে, ইউ টিউবে বেশ কিছু তথ্য জেনে নেওয়া যায়। হাওড়া থেকে লালকুঁয়া এক্সপ্রেস সকাল আটটা পনেরোতে ছেড়ে পরদিন সকালে সাতটার আগে পৌঁছয় লালকুঁয়াতে। এটা সপ্তাহে একদিন, শুধু শুক্রবারই হাওড়া থেকে ছাড়ে। আর একটা ট্রেন ,হাওড়া কাঠগোদাম বাঘ এক্সপ্রেস সবদিনই ছাড়ে, কিন্তু সময় বেশী লাগে।

গুগুলের সাহায্যে ভ্রমণ স্থানগুলির অবস্থান আর দূরত্ব দেখে নিলাম। এ ব্যাপারে বিখ্যাত ইউটিউব চ্যানেল-এর শিবাজী পালের পরামর্শ বেশ কাজের। লালকুঁয়া থেকে ভীমতাল 45 কিমি মত। এখান থেকে নৈনিতাল বাইশ কিমি মাত্র। আমি কিন্তু এখান থেকে সোজা নৈনিতাল যাবো না। আমরা এখান থেকে যাব রানীক্ষেত।

লালকুঁয়া এক্সপ্রেস নির্দিষ্ট সময়ে হাওড়া থেকে ছাড়ল। ট্রেন ছাড়ার প্রায় সাথে সাথেই আমাদের আশেপাশের সহযাত্রী সবার সাথে আলাপ হয়ে গেল। আমাদের সাথেই বসেছে তিনজন বন্ধু, মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ। জোয়ান তিন বন্ধু চলেছে ট্রেকিং করতে। হুগলীর সিঙ্গুর এর একটি বিরাট দল চলেছে আমাদের মত ভ্রমণে। আমাদের সাথে বৃদ্ধ বৃদ্ধা দুজন চলেছেন, ঐ সিঙ্গুর এর দলের সাথে। ঐ দাদু বেশ আলাপি। বয়স বললেন পঁচাত্তর। তাঁর উপর সবে পেটের ক্যান্সার এর চিকিৎসা শেষ হয়েছে। দিদার পা ভাঙ্গার পর অপারেশন হয়েছে। এদের ভ্রমণের উৎসাহ দেখলে বেশ অনুপ্রাণিত হতে হয়। দাদু দিদা তো গোটা পাঁচেক করে ব্যাগ নিয়েছেন। ব্যাগে মুড়ি, পেঁয়াজ, কাঁচা লক্ষা, ভাত তরকারী সব নিয়ে চলেছেন। দাদুর ওষুধের পোটলাটি প্রায় মুড়ির ব্যাগের সমান। আমরা সকালে বাড়ী থেকে ছাতু মুড়ি খেয়ে বেড়িয়েছি। কটা বাপুজী কেক আর একটা বিস্কুটের ছোট প্যাকেট নিয়েছি। আমি Zoop থেকে একটি লাঞ্চ প্যাক এর অর্ডার দিয়েছি। ওরা ধানবাদে ঠিক সময়ে পৌছে দিল। খাওয়া যায়। আমাদের বাড়ীর মত তেলঝাল ছাড়া রান্না বাইরে বেরিয়ে আশা করি না। রাতের জন্য ও একটি প্যাকেট অর্ডার দিয়েছি। বেনারসে একটা মজা হল। আমি Zoop এ টাকা দিয়ে রেখেছি। ওদের ছেলে এসে আমার নাম আর সিট নম্বর মিলিয়ে ব্যাগ থেকে প্যাকেট বের করার আগেই আর একটি ছেলে এসে আমার নাম জেনে একটি প্যাকেট দিয়ে টাকা চাইল। টাকা দেওয়া আছে জেনে একটু অবাক হল। আমি মোবাইল খোলার আগেই প্রথম ছেলেটি আমার নাম লেখা প্যাকেট বের করে দিল। এবার পরের ছেলেটি বলল, তাহলে অর্ডার ক্যান্সেল করলেন? বলেই তার প্যাকেট তুলে নিয়ে চলে গেল। এ খাদ্যও কষ্ট করে খেতে হল। ট্রেকিং এর ছেলে তিনজন বাড়ী থেকে রুটি তরকারী নিয়ে এসেছিল ; দু বেলা খেয়েও শেষ করতে পারল না। সকালে উঠে দেখি ট্রেন দেড় ঘণ্টা লেটে চলছে। হোটেলের থেকে সকালেই ফোন করে জেনে নিয়েছে কটা নাগাদ আমরা পৌঁছব। গাড়ীর জন্য সেই মাস দুই আগেই অগ্রিম টাকা দিয়ে রেখেছি।( Car Lalkuan, Dinesh Joshi : 9690819548) লালকুঁয়া স্টেশনে নেমে ড্রাইভারকে বার তিনেক ফোনফুনি করে অসংখ্য গাড়ী আর অটোর

ভেতর থেকে আমাদের গাড়ী খুঁজে পাওয়া গেল। সকাল সাড়ে আটটার সময় বাইরে যা গরম দেখলাম, কলকাতার থেকে বেশীই মনে হল। প্রায় মাইল দশ চলার পর পাহাড়ী রাস্তায় উপরে উঠতে থাকল গাড়ী। আরও প্রায় এক ঘন্টা চলার পর গাড়ীর এ সি বন্ধ করা গেল। আমরা এগারোটার আগেই ভীমতালের পারে আমাদের হোটেলে পৌঁছলাম। ঘরে ফ্যান চলছে। কিন্তু জল গরম করে স্নান করতে হল। আজ ১৫ ই জুন, ২০২৪.



ভীমতাল

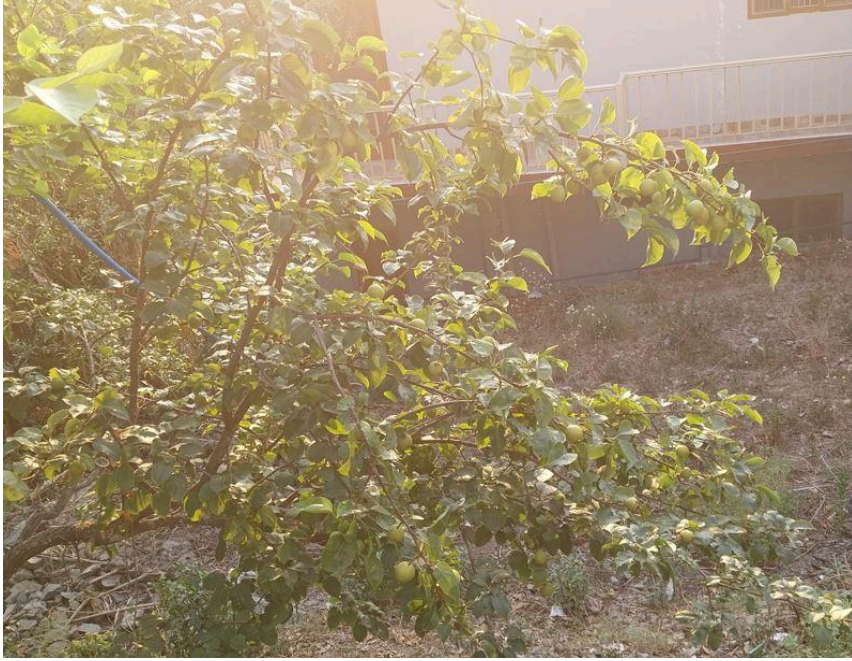
ভীমতালে দুপুরের আগে পৌঁছে রোদের জন্য কোথাও বেরোলাম না। হোটেলের ম্যানেজারের কাছে জেনে নেওয়া গেল, এখানে দেখার কি আছে। আমাদের ড্রাইভারকে বললাম, বিকেলে সাততাল দেখতে যাব। সেই মত বিকেল চারটার পর বেরোলাম। কলকাতার মত গরম না হলেও বেশ রোদ ছিল। আধ ঘন্টা মত চলে পৌঁছলাম সাততাল।



সাত তাল

ভীম তালের পাশের পাহাড়গুলি একটু নেড়া নেড়া। এদিকে বেশ গাছপালা আছে। রাস্তায় একটা জায়গা থেকে অনেক নিচে একটি ছোট পুকুর মত দেখা গেল। নাম জানলাম, গরুড় তাল। সাততালের পাড়ে গাড়ী রাখার জায়গা পাওয়াই মুশকিল। যেখানে গাড়ী পার্ক করা হল সেখান থেকে বাঁধানো রাস্তা লেকের দিকে নেমে গেছে। রাস্তার দুই পাশে শুধুই দোকান। ফার্স্ট ফুডের দোকানের ভিড়ে রাস্তাই হারিয়ে গেছে। আমরা একটি দোকানে চা খেয়ে জলের দিকে নেমে গেলাম। শত শত নৌকা সাজানো আছে। নানান রকমের নৌকা। কম বয়সী ছেলে মেয়েরা সেই সব নৌকায় চড়ে লেকের জলে ঘুরছে। মাঝে একটি ছোট সেতু আছে। আমরা সেই সেতু পেরিয়ে অন্য পারে গেলাম। দু চারটি ছবি তুলে গাড়ীতে ফিরে এলাম। আবার সেই ছায়া ঘেরা রাস্তা দিয়ে ফিরলাম। এক

জায়গায়, নিচে একটি পাড় বাঁধানো জলাশয় দেখিয়ে ড্রাইভার বলল, ওটা মানুষের তৈরী লেক। নাম নল-দময়ন্তী তাল। আমাকে গৌতমবাবু জানিয়েছেন, পাঁচশো বছর আগে, এক ভূমিকম্পে নৈনিতাল, ভীমতাল প্রভৃতি লেক গুলি তৈরী হয়েছে। সন্ধ্যায় হোটেলে বসে ক্রিকেট খেলা দেখে সময় কাটাতে ভেবেছিলাম; খেলা তো হলই না। রাত্রে আলো জ্বলে ওঠার পর লেকের পাশের পাহাড়গুলিতে আলো ঝলমল করে সুন্দর দৃশ্য তৈরী করল। রাত্রেও এখানে গায়ে চাদর গায়ে দিতে হল না। ভোরে উঠে আমাদের অভ্যাস মত হাঁটতে বেরিয়ে দেখি মেন গেটের তালা খোলা হয়নি। নীচে নেমে একজন কর্মচারীকে ডেকে তালা খোলা হোল। পাড়ার ভেতরের প্রায় সোজা রাস্তা ধরে একটু একটু করে উঠতে থাকলাম। আধ মাইল মত উঠে আবার ফিরে এলাম। একটি আম গাছের থেকে কয়েকটা কাঁচা আম রাস্তায় পড়ে আছে দেখলাম। একটি বাড়ির উঠানে একটি গাছে বড় কুলের মত অনেক ফল ধরে আছে দেখলাম। প্রথমে মনে হল আপেল। ভালো করে দেখে বোঝা গেল, ন্যসপাতি।



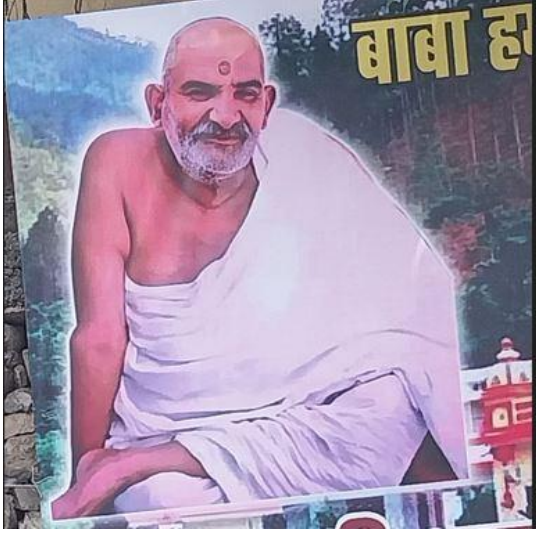
ন্যসপাতি গাছ

পরে রানীক্ষেত থেকে কৌশানি যাওয়ার রাস্তার পাশে অনেক এই রকম ন্যসপাতি গাছ ফলে ভরে আছে দেখেছি। একশ মিটার মত নেমে ভীমতাল লেকের পার ধরে হেঁটে চললাম। এপারে পরপর অনেক হোটেল। দু জায়গায় বেশ কিছু বাচ্চা সাঁতার শিখতে দেখলাম। কয়েক জায়গায় শত শত মাছ ঝাঁক বেঁধে ঘুরছে; কেউ কেউ ওদের পাউরুটি ছুঁড়ে দিচ্ছে। অনেক সাদা রাজ হাঁস জলে সাঁতার কাটছে। আমরা লেকের একেবারে উল্টো দিকে পৌঁছতেই চায়ের দোকান থেকে ডাকাডাকি শুরু করে দিল। এটি দোকানে বসে চা আর বাটার টোস্ট দিয়ে টিফিন সারলাম।

পূজার পর পর ট্রেনে দিল্লির দিকে যাওয়ার ইচ্ছা আছে। গতকাল দেখেছি, প্রথম দিনেই রাজধানীর সব টিকিট শেষ। আজ তাই ঠিক আটটায় মোবাইলে টিকিট কাটতে হবে। তাই তাড়াতাড়ি হোটেলে ফিরে এলাম। এদের WiFi ভালো। পাঁচ মিনিট আগে থেকেই IRCTC app এ লগইন করে বসে থাকলাম। ঠিক আটটায় খুলল।

৩৫৫ টি বার্থ দেখাল। আমাদের দুজনের নাম লিখে, অনলাইনে টাকা দিতে মিনিট দশেক লাগল। এর মধ্যেই ২০০ বার্থ বিক্রী হয়ে গেছে। মানে, ঘণ্টা দুই তিন পর আর পাওয়ার সম্ভাবনা নেই।

ন'টা নাগাদ বের হলাম রানীক্ষেত এর উদ্দেশে। মাঝে পড়বে এদিকের নিব করোরি বাবার কাইচি ধাম আশ্রম। গতকাল ওখানে মেলা ছিল, রাস্তা বন্ধ ছিল। আজও রাস্তায় প্রচুর গাড়ী। ধামের আট দশ মাইল আগে থেকেই গাড়ী আর এগোয় না। ধাম পেরোতে তিন ঘণ্টা লাগল। একটু আগে থেকেই পাহাড়ের উপরের রাস্তা থেকে নিচে আশ্রমের মন্দির, ভিড় সব দেখতে পাচ্ছিলাম। ড্রাইভার একবার জানতে চাইল, আশ্রমে ঢুকতে চাই কি না। ঐ ভিড় দেখেই আমাদের সব আগ্রহ শেষ। বিকেল তিনটা নাগাদ রানীক্ষেত পৌঁছলাম।



নিব করোরী বাবা

রানীক্ষেত এ পৌঁছেছি কি না বোঝার আগেই রাস্তার পাশে দেখি, মেঘদূত হোটেল। গাড়ী থামাতে বললে ড্রাইভার বলল, আগে মন্দিরটা দেখে আসি। হোটেল ছাড়িয়ে দেড় দুই কিমি এগিয়ে পৌঁছলাম, ঝুলা দেবী মন্দির। ছোট একটি মন্দির। কিন্তু ঢোকান রাস্তার উপরে আর দুপাশে অসংখ্য ঘণ্টা ঝুলছে। এখানে মানত করে কিংবা মনস্কামনা পূর্ণ হলে, লোকে একটি করে ঘণ্টা ঝুলিয়ে রেখে যায়। ছোট বড় বিভিন্ন মাপের ঘণ্টা, কত বছর ধরে ঝুলছে বোঝার উপায় নেই।



মন্দিরে যাত্রী তেমন নেই। দুজন একজন করে যাত্রী আসছে। ওখান থেকে ফেরার সময়ও হোটেল গাড়ী দাঁড়াল না। ড্রাইভার বলল, মিউজিয়াম বন্ধ হয়ে যাবে, আগে দেখে আসি। রানীক্ষেত কুমায়ুন রেজিমেন্ট এর হেড অফিস। গোটা শহরটাই আসলে মিলিটারী ক্যান্টনমেন্ট। অত্যন্ত সুন্দর সাজানো রাস্তাঘাট। শুধু শহরটাই দেখার জন্য আসা যায়। মাথা পিছু পঁচাত্তর টাকা করে টিকিট কেটে মিউজিয়ামে ঢুকলাম। সেই টিপুর সুলতানের সময় থেকে হালের কার্গিল যুদ্ধ পর্যন্ত ইতিহাসের নানান ছবি, তরোয়াল, বন্দুক ইত্যাদি সাজানো আছে। আর আছে এই কুমায়ুন রেজিমেন্ট এর বহু বীরের ছবি আর তাদের বীরত্বের ইতিহাস। ভেতরে ছবি তোলায় অনুমতি নেই। বাইরেও কয়েকটি কামান সাজানো আছে।

ওখান থেকে শহরের ভেতর দিয়ে গিয়ে , অন্য প্রান্তে একটি ছোট্ট পাহাড়ের নীচে পৌঁছে ড্রাইভার বলল, ওপরে মন্দির আছে দেখে আসুন। গাছের ছায়ায় ছায়ায় শ'খানেক সিঁড়ি ভেঙ্গে একটি ছোট্ট মন্দিরে পৌঁছলাম। মন্দির এখানে দুটি, কালী আর দুর্গা। এখানে আসার আগেই আমরা আরও একটি জায়গায় মন্দির, গীর্জা আর গুরুদ্বারা দেখেছি। রেজিমেন্টের সেনাদের ট্রেনিং শেষ হলে, এই জায়গায় শপথ নিতে হয়। শহরের মধ্যেই একটি গল্ফ গ্রাউন্ড এর পাশ দিয়ে গেলাম। এটিও একটি দেখার মত জায়গা। কিন্তু অনেকদিন বৃষ্টি না হওয়ায় ঘাসের রং ধূসর। মনে পড়ল , উটি যাওয়ার পথে কাল্লরে সুন্দর সবুজ গল্ফ গ্রাউন্ড দেখেছিলাম। পরে ঐ ক্যাল্লোর এ সেনা প্রধান এর হেলিকপ্টার ভেঙ্গে পড়ে জায়গাটা কুখ্যাত হয়েছে। আমরা হোটেল চুকলাম সাড়ে তিনটা চারটার দিকে। এই মেঘদূত হোটেল এর বাড়ীটি একটি বহু পুরাতন বাড়ী, 1911 সালে তৈরী। বেশ বড় হোটেল, যাত্রীও অনেক এসেছে দেখলাম। হোটেলের নীচের রেস্টুরেন্টও বেশ বড়। ভোরে উঠে আমরা পিছনের দিকের সরু রাস্তায় হাঁটতে শুরু করলাম। একটু দূরে একটি ময়ূর রাস্তা পেরিয়ে গেল দেখলাম। কাছে গিয়ে ছবি তোলায় সময় দেখলাম, ওটা অন্য পাখী। পরে ছবি দেখে অনেকে জানিয়েছেন, ফিজেন্ট । বড় রাস্তায় ফিরে এসে দেখি দুটি বাসে করে 50-60 জন স্কুলের ছাত্র ছাত্রীকে এনেছে। পরে ওরা রাস্তা ধরে দৌড় দিল।

আমরা ন'টা নাগাদ হোটেল ছেড়ে কৌশানীর দিকে রওনা দিলাম। ঘন্টা খানেক গাড়ী চলার পর আমার স্ত্রী বেশ অসুস্থ হয়ে পড়ে। মাঝের বড় সিট এ ওকে শুইয়ে বাকী রাস্তা এলাম। হোটলে পৌছেও সারাদিন শুয়েই থাকল। আমার কাছে কিছু ওষুধ ছিল, কিছু পাশের একটা দোকান থেকে কিনে আনলাম। হোটেল থেকে একশ দেড়শ মিটার উপরেই গান্ধী আশ্রম। ড্রাইভারের সাথে আমি একাই হেঁটে উঠে দেখে এলাম। এই আশ্রমের নাম অনাসক্তি আশ্রম।



গান্ধী আশ্রম, কৌশানি

এখানে থাকার সময় সুন্দর প্রকৃতি দেখে, গান্ধীজী একে মিনি সুইজারল্যান্ড বলেছিলেন। আকাশ পরিষ্কার থাকলে, আশ্রমের চত্বর থেকে হিমালয়ের বরফ ঢাকা শৃঙ্গ দেখতে পাওয়া যায়। আমরা কিছুই দেখতে পেলাম না। বিকেলে আমার স্ত্রী একটু সুস্থ হয়ে, হোটেলের চত্বরে হাঁটার সময় এক বাঙালি মহিলার সাথে আলাপ করে জানল, ওনারা একটি দল বর্দিনাথ থেকে ফেরার পথে এখানে বিশ্রাম নিতে থাকছেন। আসার পথে দেখেছি, কৌশনী থেকে কর্নপ্রয়াগ প্রায় দু'শো কিমি। আমার তো পাহাড়ী রাস্তায় 60-70 কিমি একদিনে যেতেই কষ্টকর মনে হয়। বিশেষ করে দুপুরে তো বেশ গরম পড়ছিল। পরদিন সকালে উঠে আমরা দুজনে গান্ধী আশ্রম ঘুরে এলাম। সকালে দেখি আমারও পেট খারাপ। এই নিয়ে আরও দিন চারেক বাইরে বাইরে ঘুরতে হবে। একটু ঝামেলায় পড়তে হল। দু' লিটার ORS খেয়ে বিনসার এর উদ্দেশে রওয়ানা দিলাম। 18.6.24.

কৌশানির হোটলে থেকে বেরিয়ে উল্টো দিকে দুই কিমি মত নেমে একটা চা বাগানের নিচে গিয়ে দাঁড়ালাম। এখানে কিছু দোকানপাট আছে। বিশেষ করে শাল ফ্যাক্টরি। এই শাল ফ্যাক্টরি ব্যপারটা এখানে কুটির শিল্পের মত। এদিক ওদিক অনেক আছে। আমরা শাল কিনব না, তাই আর শাল তৈরীও দেখলাম না। একটু ওপরে উঠে চা ফ্যাক্টরি। ঢোকান জন্য টিকিট কাটতে হবে। চা বাগানের অবস্থাই করুন দেখলাম। আগে আমরা চা ফ্যাক্টরি দেখেছি, তাই আর ঢুকলাম না। কৌশনী থেকে রাস্তা নামতে নামতে একেবারে সমতলে চলে এল। এখানে একটা সরু নদী আছে, শুধুই পাথর, জল দেখা যায় না। ঐ নদীর দুই পাড়ে ধানের চাষ হচ্ছে। নদীর পাশ দিয়ে কয়েক কিমি এগিয়ে আবার আস্তে আস্তে পাহাড়ে উঠতে থাকল রাস্তা। একটা সময় ডান দিকের পাহাড়ের গায়ে বেশ বড় শহর দেখা গেল। আলমোড়া শহর। আমরা শহরের দিকে না গিয়ে বিনসারের দিকে চললাম। আলমোড়া থেকে আধ ঘন্টা মত এগিয়ে পৌঁছলাম চিতোই গোলু দেবতার মন্দিরে।



মন্দিরে ঘন্টার সাথে লেখা মনস্কামনা চিঠি

YouTube এর কল্যাণে এই মন্দিরের খবর জানা ছিল। বড় রাস্তার পাশে, মন্দিরে ঢোকান গেটের পাশে বেশ কয়েকটি দোকান রাস্তার উপরে বসে গেছে। দূর থেকেই দেখা যায়, প্রচুর ঘন্টা সাজিয়ে রেখেছে। পূজার ডালি আর ঘন্টা বিক্রী করছে। এরাই জুতো জমা রাখছে। আমরাও একটা পূজার ডালি কিনে নিয়ে ঢুকলাম। কয়েকটি সিঁড়ি ওঠার পরই ঘন্টা আর ঘন্টা। যেকোনো তাকানো যায় শুধু ঘন্টা ঝুলছে, হাজারে হাজারে। ছোট বড় নানান সাইজের ঘন্টা। ছোট বড় যে যেখানে হাত পাচ্ছে ঘন্টা বাজিয়ে দিচ্ছে। ডান দিকে একটি বাঁধানো চত্বরের পাশ দিয়ে পূজা দেওয়ার লাইন একেবেকে চলেছে। আমরাও লাইনে দাঁড়ালাম। এক ঘন্টা দাঁড়িয়ে পূজা দেওয়া গেল। কিন্তু দেবতার মূর্তি কিছুই ঝুললাম না। নারকেলটি রেখে বাকী জিনিস ফেরৎ দিল। একটি প্রায় 100 কেজি ঘন্টার ছবি তুলে ফিরে এলাম।

গাড়ী চলল বিনসারের দিকে। রাস্তার পাশে ঘর বাড়ী খুবই কম। ওপরে নীচে পাহাড়ের গায়ে গায়ে শুধুই চীর গাছ। সোজা সোজা দাঁড়িয়ে আছে, পাতা খুব কম। দেখলে মনে হবে, কেউ বোধহয় গাছগুলি লাগিয়েছে। যেকোনো তাকানো যায় শুধুই ঐ একই রকম গাছ।



চীর বন

পরে বিনসর অরণ্যেও দেখেছি ঐ একই দৃশ্য। অন্য গাছ হাজারে একটা হবে। মুন্সিয়ারি যাওয়ার রাস্তা ছেড়ে ডান দিকে কাঁচা রাস্তা ধরল গাড়ী। মাইল তিনেক খুবই অসমান পাথুরে রাস্তা। অন্য কোন গাড়িও দেখলাম না। মাইল দুই যাওয়ার পর গোটা দুই হোমস্টেট। আরও এক মাইল গিয়ে আমাদের হোমস্টেট পেলাম। ডান দিকে দূরে দূরে পাহাড়। গাছ শুধুই চীর। বাতাসে সো সো শব্দ। এদের ঘরে কোন ফ্যান নেই। ঝুললাম, তেমন গরম পড়ে না। পরদিন সকালে সামনের মাঠে হাঁটতে গিয়ে দেখলাম ঠাণ্ডা লাগছে। এবার পাহাড়ে ভ্রমণ করতে এসে এই প্রথম একটু ঠান্ডা পেলাম। সকাল আটটার পরই বেরিয়ে পড়লাম।

আজকের গন্তব্য কাছেই, মাত্র 16 কিমি দূরের কাসার দেবী। এটা আলমড়া শহরের বাইরে। আমাদের সেই দুর্গম হোমস্টে থেকে বেরিয়ে প্রথম তিন কিমি মত পাথুরে রাস্তা। তারপর পাকা রাস্তা। পিছন দিকে এ রাস্তা চলে গেছে মুন্সিয়ারি। এবার আমরা ওদিকে যাব না। আলমোড়া থেকে প্রায় পৌনে দুশো কিমি। সেই দাদুদের সিঙ্গুর এর দলটি মুন্সিয়ারি যাবে। শীতকালে ওখান থেকে হিমালয়ের বরফ ঢাকা শৃঙ্গ দেখতে পাওয়া যায়। আমরা তো কৌশানী থেকে কিছুই দেখতে পেলাম না। এই পাকা রাস্তা ধরে কয়েক কিমি এগিয়ে আমাদের গাড়ী ডান দিকে একটা ছোট রাস্তা ধরল। একটু এগিয়েই দেখি সেই পাথুরে রাস্তা। দুপাশের পাহাড়ে সেই চীর গাছ আর চীর গাছ। প্রায় এক ঘন্টা নির্জন বনের ভেতর দিয়ে চলে একটি মন্দিরের নীচে পৌঁছলাম। এই এক ঘন্টার রাস্তায় আর একটিও গাড়ী দেখিনি। মাঝে মাত্র তিনজন দেহাতি মহিলা ঘাসের বোঝা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দেখেছি। এটাও বিস্ময় জঙ্গল। একটি পাখিও নেই। ঝাঁঝি পোকাকার ডাকও নেই। এই মন্দিরটিও গোলু দেবতার। যাত্রী প্রায় নেই। মন্দিরের পরই বড় রাস্তা। ডান দিকে চলে গেছে যোগেশ্বর। আমরা বাঁ দিকে আরও আধ ঘন্টা চলার পর কিছু কিছু বাড়ী ঘর দেখা গেল। রাস্তার পাশে আমাদের হোটেল দেখতে পেলো আরও এগিয়ে গেলাম। একটা মোড়ের মাথায় গাড়ী দাঁড়াল। আমরা নেমে পাহাড়ের গায়ে বাঁধানো সিঁড়ি ধরে মন্দিরের দিকে উঠলাম। শ থানেক সিঁড়ির উপর কাসার দেবীর মন্দির। ছোট মন্দির। খুবই সাদামাটা। যাত্রীর লাইন নেই, তবে কিছু যাত্রী আছে। মন্দির ছাড়িয়ে আরও এগিয়ে, আবার কুড়ি পঁচিশ সিঁড়ি উঠে শিব মন্দির। শিব মন্দিরে ওঠার আগে, বাঁ দিকে একটি সরু পায়ে হাঁটার রাস্তা। লোকজন ওদিকে কেউ যাচ্ছে না। আমরা একজনকে জিজ্ঞেস করে এগিয়ে গেলাম। YouTube এ দেখা ছিল, তাই চিনলাম। একটি বড় পাথরের গাড়ী বারান্দার মত; এর নিচেই সেই বিখ্যাত গুহা। এক জ্যোতিষ দুজন খন্দের পেয়ে ব্যস্ত আছে দেখলাম। ওখানে একটু বসার ইচ্ছা থাকলেও হতাশ হলাম। এবার চোখে পড়ল নীচে একটি সংকীর্ণ গুহা। সেখানে দুটি আসন পাতা রয়েছে। বুললাম ওটাই সেই মোক্ষম জায়গা যেখানে স্বামী বিবেকানন্দ ধ্যান করেছিলেন। আমি সাবধানে নেমে গেলাম সেই গুহায়। আসনে বালি থাকলেও একটিতে বসে গেলাম। মিনিট পাঁচেক বসে উঠে এলাম।



স্বামী বিবেকানন্দের ধ্যান গুহা

এই জায়গা সম্বন্ধে অনেক কথা শুনেছি। এ জীবনে ওখানে পৌঁছতে পেরেছি সেটাই সৌভাগ্য। এই কাসার দেবী মন্দির এর পাহাড়ে নাকি বিশেষ মহাজাগতিক চুম্বক ক্ষেত্র আছে। অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি এখানে এসে ধ্যান করেছিলেন। পরে উপরের শিব মন্দির চত্বরে দেখলাম, কয়েকজন চোখ বন্ধ করে বসে আছেন। বিশেষ কোন অনুভূতি হল কিনা, কয়েকজন জানতে চেয়েছেন। আমি কিছুই বুঝতে পারিনি। কুমোরের বাড়ীতে এক তাল মাটি নিয়ে ঢুকলেই কি একটু ঘট নিয়ে বেরিয়ে আসা যায়। মাটির তাল থেকে ঘট তৈরীর যে সাধনা সেটা অর্জন করতে কুমোর এর কত বছর লাগে!

কাসারদেবী মন্দির থেকে নেমে আসার পর আমাদের ড্রাইভার বলল, 200 মিটার এগিয়ে গিয়ে সারদা মঠ দেখে নিন। পাহাড়ের গা বেয়ে পাকা রাস্তা। নিচে, বহু নিচে মাঠ দেখা যাচ্ছে। অনেক দূরে কয়েকটা বাড়ী ঘর। একটু দূর থেকেই সারদা মঠের বড় লোহার গেট দেখা যায়। বন্ধ। পাশে ছোট্ট একটি গেট আছে। ভেতরে একটু পাহাড়ের ঢাল ধরে রাস্তা উঠেছে। প্রথমে নিবেদিতা ভবন। তার পিছনে ছোট মন্দির। মন্দিরের তিনটি দরজা, ভেতর থেকে বন্ধ। কাচের ভেতর দিয়ে উঁকি দিয়ে ভেতরটা দেখে ফিরে আসছি, এমন সময় একজন ব্রহ্মচারিণী এসে একটি দরজা খুলে দিলেন। মন্দিরে ঠাকুর, মা আর স্বামীজী তিন জনের ছবি রাখা আছে। প্রণাম করে ফিরে এলাম। পাহাড়ের উল্টো দিকে আমাদের হোটেল। কাসার দেবী মন্দিরের প্রায় নিচেই। বিকেলে আবার হাঁটতে হাঁটতে মন্দিরের দিকে চললাম। এবার খেয়াল করলাম, হোটেলের অনেক কাছেই মন্দিরে ওঠার রাস্তা আছে। বেশ মেঘ করে এসেছে। কিন্তু অনেক লোক জনও উঠছে। আমরা এবার ও শিব মন্দির চত্বরে ঘুরে এলাম। বৃষ্টি আসতে পারে দেখে সকলে নেমে চললাম। পাহাড়ের প্রায় নিচে নামার পর টিপ টিপ বৃষ্টি নামল। পা চালিয়ে হোটলে পৌঁছে চাবি নিতে নিতেই জোরে নামল বৃষ্টি। দুপুরে ছিল প্রচণ্ড গরম। রাত্রে কন্ঠল গায়ে ঘুমিয়েছি। সকালে উঠে প্রথমে হাঁটতে হাঁটতে সারদা মঠ পর্যন্ত গিয়ে ফিরে এলাম। মন্দিরের নিচের রাস্তা থেকে উল্টো দিকের পাহাড়ে আলমোড়া শহর দেখা যায়। বোঝা যায় না যে ওটা দশ কিমি দূরে। পরদিন সকালে যাওয়ার সময় আমাদের পঁচিশ কিমি ঘুরে যেতে হল। সকালে উঠে চা খাওয়ার অভ্যাস থাকলে এসব জায়গায় মুশকিল। হোটেলের চা আটটার আগে হয় না। বাইরেও চায়ের দোকান খোলে না। আমরা হোটেলের নীচের রাস্তা ধরে উল্টো দিকে চলতে থাকলাম। ওদিকেও কয়েকটা হোটেলের বোর্ড দেখা যাচ্ছে। এক দেড়শ মিটার এগিয়ে দেখি একটি বৌদ্ধ আশ্রম। এরা মোনাস্ট্রী লেখেনি। আমাদের গেটের বাইরে দেখে এক মহিলা এসে গেট খুলে দিলেন। দুটি বড় লোমওলা কুকুর ভেতরে ঘুরছে। ওরা কিন্তু ডাকাডাকিও করল না। মন্দিরের দরজা বন্ধ ছিল। এক লামা এসে দরজা খুলে দিলেন। আমরা ভেতরে ঢুকে কয়েক মিনিট বসে বেরিয়ে এলাম। হোটলে ফিরে স্নান করে আটটা নাগাদ বেরিয়ে পড়লাম। আজ আমাদের গন্তব্য নৈনিতাল। আমরা আলমরা শহর ঘুরে যাব।

আমাদের ড্রাইভার লালা বদ্রিদাসজীর বাড়ী জানেনা। বাজারের ভেতর ঐ বাড়ী বলায় ও বলল, বাজারে গাড়ী যাবে না, হেঁটে যেতে হবে। আমরা তাতেই রাজী। শহরটা প্রায় এক পাক ঘুরে আমরা রামকৃষ্ণ মিশনের কাছে পৌঁছলাম। এর নাম রামকৃষ্ণ কুটির। রাস্তার পাশে তুরিয়ানন্দ গেট। সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে স্বামী বিবেকানন্দ এর বড় মূর্তির কাছে পৌঁছতে হল। এখানে কোন মন্দির দেখলাম না। ওখান থেকে কিছুটা এগিয়ে, জেলা হাসপাতালের কাছে গাড়ী দাঁড়াল। ড্রাইভার বলল, সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে বাজার। গাড়ী আরও এক পাক ঘুরে

নিচের রাস্তায় থাকবে। আমরা সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ এর কাছে গাড়ী পাব। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে বাজার পেলাম। বাজারের দোকানপাট সব খুলছে। বেশ জমজমাট বাজার। সেই বাড়িটি আমি দেখলেই চিনব। তবুও একজনকে, স্বামী বিবেকানন্দ যে বাড়ীতে ছিলেন, বলার আগেই আরও এগোতে বললেন। লালার সেই বিখ্যাত বাড়ীর বাইরে স্বামীজীর ছবি দেওয়া বোর্ড আছে। নিচে দু একটা দোকান আছে। কিন্তু বাড়ীটির দরজা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। নিচের এক দোকানে জানতে চাইলে বলল, ওনার সব ঘুরতে বেরিয়ে গেছেন। ভেতরটা দেখা হল না। রাস্তার উল্টো দিকে একটি লাল রঙের বাড়ীতে স্বামীজীর ছবি দেওয়া বোর্ড আছে।



স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা স্থান

এই বাড়ীর বারান্দায় দাঁড়িয়ে স্বামীজী বক্তৃতা দিয়েছিলেন। দু একটা ছবি তুলে ফিরে এলাম। আলমোরার বাজার থেকে একটা ছোট শীতের পোশাক কিনে ফিরে এলাম। গাড়ী চলল নৈনিতালের দিকে। ভীমতাল থেকে যে পথে ওদিকে গেছলাম, সেই পথেই অনেক সময় ফিরে এলাম। আবারও পড়ল কাইচি ধাম। ভাবলাম মেলা চলে গেছে দিন চার পাঁচ আগে, তাহলে আর ভিড় হবে না। একবার বাবার ধাম ঘুরে যেতে পারি। কিন্তু ধামের কাছে এসে দেখি, সমান ভিড়। ওপর থেকে দেখতে পেলাম বিশাল লম্বা লাইন। ভাওয়ালি শহরে পৌঁছে ডান দিকের রাস্তা ধরে গাড়ী চলল। এখান থেকে নৈনিতাল এগারো কিমি। যখন আর নয় কিমি বাকী, ভাবলাম প্রায় পৌঁছে গেলাম। এই সময় একটি দুই রাস্তার মোড়ে এসে গাড়ী দাঁড়িয়ে গেল। পুলিশ সব গাড়ী আটকে দিয়েছে। কোন গাড়ী নৈনিতাল যাবে না। কি ব্যাপার? কেন গাড়ী যাবে না, কেউ কিছুই বলতে পারল না। ফিরে এলাম ভাওয়ালী।

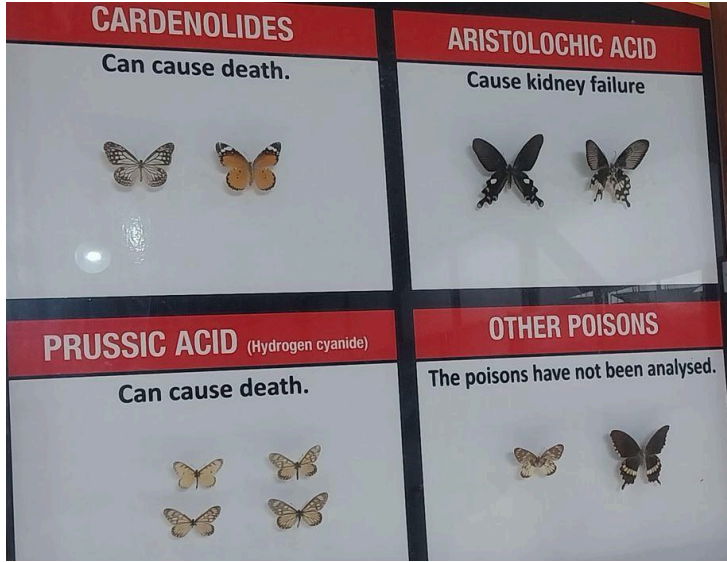
ভাওয়ালি ঢোকান মুখে একটি রাস্তার পাশের হোটেলে ঢুকলাম। এখানে দুপুরে কিছু খেয়ে পরে আবার নৈনিতালের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করে দেখব। এদের সকলের হাবভাব দেখে মনে হচ্ছিল আজ আর নৈনিতাল যাওয়া হবে না। একমাত্র নৈনিতাল এর হোটেলের ম্যানেজার ফোনে জানাল, দু এক ঘন্টা পর পর গাড়ী ছাড়ে। আমরা এক ঘন্টা পর ফিরে এসে দেখি, কোন গাড়ী দাঁড়িয়ে নেই, পুলিশও নেই। নৈনিতাল শহরে ঢোকান প্রায় আধ কিমি আগে থেকে গাড়ী শমুক গতিতে চলল। লেকের পাড়ে পৌঁছে বোঝা গেল কেন শহরে গাড়ী ঢুকতে

দিচ্ছিল না। অসংখ্য গাড়ী, তার থেকেও বেশি মানুষ রাস্তা দিয়ে চলেছে। লেকের যে পারে মল রোড সেদিকে নিচের রাস্তা একদিকে আর উপরের রাস্তা দিয়ে উল্টো দিকে গাড়ী চলছে। ড্রাইভার আমাদের বলে রেখেছিল, নীচের রাস্তায় তাড়াতাড়ি নেমে পড়তে হবে। কয়েকটা সিঁড়ি বেয়ে উঠে মল রোড পেরিয়ে আমাদের হোটেল। রাস্তা থেকে কুড়ি তিরিশ ফুট উপরে আমাদের হোটেল। ট্রলি ব্যাগ দুটি টেনে উঠতে হল। আমাদের ঘর দিয়েছে ছয় তলায়। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হয়। লিফ্ট ছাড়া এতোটা অনেকদিন ওঠা হয়নি। কিন্তু হাফাচ্ছি না দেখলাম। ঘরের ভেতর থেকেই লেকের জলে নৌকা চলছে দেখলাম। বিকেলে লেকের পাড়ে হাঁটতে বেরোলাম। এরকম ভিড়ের বেড়ানোর জায়গা কোনোদিন দেখিনি। ভিড় ঠেলে ঠেলে নয়না দেবীর মন্দির এ পৌঁছলাম। বাইরে থেকে পূজার ডালি কিনে নিয়ে মন্দির চত্বরে ঢুকলাম। যাত্রী অনেক আছে, কিন্তু পূজা দেওয়ার লাইন নেই। মন্দির ছাড়িয়ে বাজারের ভেতর দিয়ে লেকের অন্য পারে চলে এলাম। এদিকে খুব একটা লোক জনও নেই। রাস্তাও খুব ভালো নয়। এ পারে কয়েকটা ছোট ছোট মন্দির আছে। এখানে সন্ধ্যা হয় অনেক পরে, প্রায় সাতটা নাগাদ। সব মন্দিরে ঘন্টা বাজিয়ে সন্ধ্যা আরতি শুরু হল। আমরা হাঁটতে হাঁটতে একটা জায়গায় পৌঁছে দেখি, রাস্তা প্রায় বন্ধ। ওপর থেকে ধ্বস নেমেছে। সারানোর কাজ চলছে। গোটা লেক একপাক ঘুরে হোটলে ফিরতে রাত আটটা বেজে গেল। এদের ঘরের টিভিতে ক্রিকেট বিশ্বকাপের খেলা দেখতে পেলাম।



পরদিন ভোরে উঠে আবার সেই নয়না দেবীর মন্দির এর দিকে হেঁটে চললাম। গতকাল বিকেলের মেলার মত ভিড়ের কিছুই নেই। দোকানপাট সব বন্ধ। পাশেই একটি বিশাল মাঠ। মাঝে একটা হকি খেলার মাঠ। তাছাড়া আরও যা জায়গা আছে, দু টি ফুটবল খেলার মাঠ হয়ে যাবে। গোটা দুই ফুটবল মাঠের মত জায়গায় কয়েকশ গাড়ী রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। অন্য পাশের বাস্কেট বল খেলার মাঠে যোগ দিবস পালনের তোড়জোড় চলছে। আমরা পৌনে সাতটা নাগাদ নৌকার ঘাটের কাছে এসে দেখি , তখনও বোটিং শুরু হয়নি। সাতটা বাজতে আমাদের ডেকে নিল। আমাদের সাথে আর একটা নৌকায় তিনটি ছেলে উঠল। একজন মাঝি দু হাতে দাঁড় টেনে আমাদের আধ ঘন্টা ঘুরিয়ে আনল। মাঝির কাছেই কয়েকটা খবর জেনে নিলাম। লেকের জলে যে ঝাঁক ঝাঁক মাছ ঘুরে বেড়াচ্ছে, সরকারই মাঝে মাঝে বড় মাছ ধরার ব্যবস্থা করে। মে জুন নৈনিতালের সবথেকে বেশী টুরিস্ট আসার সময়। জুলাই থেকে পূজার ছুটি পর্যন্ত নৌকা প্রায় চলেই না। তখন ওরা গ্রামে গিয়ে চাষ আবাদ করে। সাড়ে নটায় আমাদের ড্রাইভার আমাদের ডেকে নিল। বেরোলাম নৈনিতালের দর্শনীয়

স্থানগুলো দেখতে। শহর থেকে বেরিয়ে মাইল তিন চার দূরে হনুমান মন্দিরে পৌঁছলাম। অনেকটা জায়গা জুড়ে হনুমান, মা অঞ্জনা, শিব মন্দির ছাড়াও নিব করোরি বাবার প্রার্থনা গৃহ দেখে নেমে এলাম। একটু ছোলা সেদ্ধ প্রসাদ দেওয়া হল। এরপর গেলাম, জল প্রপাত দেখতে। পঞ্চাশ টাকার টিকিট কেটে, শ দেড়েক সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে দেখলাম জলপ্রপাত। ফুট দশেক উপর থেকে জল পড়ছে। অনেকেই জুতো খুলে, জলে নেমে ছবি তোলায় চেষ্টা করছে। সিকিম, মেঘালয়, পাঁচমারিতে এত সব লম্বা লম্বা জলপ্রপাত দেখেছি যে এটাকে তেমন দেখার মত মনে হল না। ওখান থেকে চললাম, বোটানিক্যাল গার্ডেন। এই তিন চার কিমি যেতে ঘন্টা দেড়েক লাগল। গোটা রাস্তায় শুধুই ট্যুরিস্ট গাড়ী। পাহাড়ের ধাপে ধাপে নানান রকমের গাছ। গাছদের নাম লেখা বোর্ড। আমাদের ভালো লাগল, পতঙ্গ সংগ্রহশালা। বিষধর প্রজাপতিও যে হয়, এই প্রথম জানলাম।



এর পরের গন্তব্য ছিল কেভ গার্ডেন। গাড়ীর জ্যামের জন্য আর কোথাও নামার উৎসাহ পেলাম না। সোজা হোটেলে ফিরে এলাম। বিকেল চারটে নাগাদ প্রবল বৃষ্টি নামল। এক দেড় ঘন্টা চলল বৃষ্টি। ছটার পরও মেঘ করে থাকল। বেরোব কি না ভাবতে ভাবতে আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল। অনেকেই ছাতা নিয়ে বেরিয়েছে। আমরা ঘন্টা খানেক রাস্তায় ঘুরে এলাম। বৃষ্টির পর রাত্রে বেশ ঠাণ্ডা পড়ে গেল। 22 তারিখ আমাদের নৈনিতালে শেষ সকাল। ভোরে উঠে বেরোনোর সময় সোয়েটার গায়ে দিতে হল। আজও সকালে রাস্তায় চা খেতে হল। আজ হাঁটতে হাঁটতে বড় বাজারের দিকে চলে গেলাম। নৈনিতালের জেলা হাসপাতালের কাছে এই বড় বাজার। দু একটি দোকান এই সকালেই খুলে গেছে। আমরা বাজারের অন্য দিক দিয়ে নেমে এলাম নয়না দেবীর মন্দির এর কাছে। মন্দিরের পাশেই গুরুদ্বয়ার। আমরা জুতো খুলে ঢুকে যাচ্ছিলাম; ডেকে মাথা ঢাকতে বলল। একটি পাত্রে কিছু কাপড়ের টুকরো রাখা ছিল, তার একটি নিয়ে, মাথায় রুমালের মত বেঁধে নিলাম। ভেতরে ভক্তি সঙ্গীত বাজছিল। আমরা প্রণাম করে বেরিয়ে এলাম। একজন ডেকে প্রসাদ দিল। হোটেলে ফিরে খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম, রান্নার ছেলেরা তখনও আসেনি। আবার বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে একেবারে বাস স্ট্যান্ড এর কাছে এসে দেখলাম দু একটা দোকান খুলেছে। আমরা এক জায়গায় ব্রেকফাস্ট করে নিলাম। একটি বড় ফলের দোকান থেকে কিছু ফল কিনে হোটেলে ফিরে এলাম। গাড়ীর মালিক দীনেশ জোশি জানালেন যে অন্য গাড়ী আসবে। এ

কদিন যে ড্রাইভার আমাদের নিয়ে ঘুরেছে, সে আগের রাতে একটা ছোট এক্সিডেন্ট করেছে। নতুন ড্রাইভার অন্য গাড়ী নিয়ে আসবে। আমরা দশটার আগে স্নান করে, ব্যাগ গুছিয়ে বসে থাকলাম। ঠিক সাড়ে দশটায় গাড়ী এসে গেল। আমরা লালকুমার উদ্দেশে রওনা দিলাম। এবার বাড়ী ফেরার রাস্তা।

কদিন ধরে নৈনিতাল ঢোকা বেরোনোর রাস্তায় যা গাড়ীর জ্যামের অবস্থা দেখেছি, তাতে করে অনেক সময় নিয়ে বেরোনোই উচিত। আজ কিন্তু তেমন অবস্থা দেখলাম না। যদিও শহরের বাইরে একটা জায়গায় দেখলাম, গাড়ী আটকাচ্ছে। আধ ঘন্টা মত নেমে আসার পর গাড়ী মেঘের ভেতর দিয়ে চলল। আরও কিছুটা চলার পর বৃষ্টি নামল। একটা দোকানের কাছে গাড়ী থামিয়ে ড্রাইভার বলল, চা খেতে চাইলে নামতে পারেন। বৃষ্টির জন্য নামা গেল না। ড্রাইভার বলল আর মিনিট পনেরোর মধ্যে কাঠগোদাম পৌঁছে যাব। এই সময় থেকেই দেখলাম, রাস্তায় বেশ গাড়ীর ভিড়। কাঠগোদাম পৌঁছানোর অনেক আগেই বৃষ্টি থেমে গেল। কাঠগোদাম সমতলে। এখানে রাস্তাও বেশ চওড়া। দূর থেকে কাঠগোদাম রেল স্টেশন দেখলাম। আমাদের গাড়ী লালকুমার স্টেশন থেকে। বড় রাস্তায় বেশ জোরে গাড়ী চালিয়ে, মিনিট কুড়ির মধ্যে আমাদের লালকুমার পৌঁছে দিল। যাওয়ার দিন দেখেছিলাম, গাড়ী লোকজনের ভিড়। আজ আমরা আমাদের গাড়ী ছাড়ার সাত ঘন্টা মত আগেই এসেছি। স্টেশনে ঢোকানোর আগে বড় রাস্তায় একটা হোটেলে খেতে গেলাম। খুবই সাধারণ হোটেল। স্টেশনে ওয়েটিং রুমে এসে বসলাম। সে সময় আর চার পাঁচ জন যাত্রী শুয়ে বসে ছিল। বেশ গরম ছিল। এটা খুবই ছোট স্টেশন, এখানে এসি ওয়েটিং রুম নেই। পরে পরে, দলে দলে যাত্রী এসে পৌঁছতে থাকল। সবই পাহাড়ের দিকে ভ্রমণ করে ফিরছে। সবই প্রায় বাঙালি। আসলে এই ট্রেন টি সপ্তাহে একদিন করে চলে। হাওড়া থেকে শুক্রবার সকালে ছেড়ে শনিবার সকালে লালকুমার পৌঁছায়। আবার শনিবার সন্ধ্যায় ছেড়ে রবিবার সন্ধ্যায় হাওড়ায় ফেরে। এদিকে যারা ঘুরতে আসে, তারা সেই মত ঘোরার প্ল্যান করে। গরমের মধ্যে ছয় সাত ঘন্টা বসে কাটানো বেশ কষ্টকর। আমাদের দিনেই ট্রেনটা আবার দেরী করে ছাড়ল। বিকেল পাঁচটা থেকে লাগাতার ঘোষণা করে গেল, ঠিক সময়ে সন্ধ্যা সাতটা পঁচিশ এ ছাড়বে। সাতটা পঁচিশ পর্যন্ত গাড়ীর দেখা নেই। তখন বলতে শুরু করল, সাতটা চল্লিশ ছাড়বে। তখনও গাড়ী লুপ লাইনে দাঁড়িয়ে। শেষ পর্যন্ত আটটা দশ নাগাদ গাড়ী দিল। প্রায় এক ঘন্টা দেরী করে গাড়ী ছাড়ল।

এবারের যাত্রায় ট্রেন খুব একটা ভালো পেলাম না। এই হাওড়া লালকুমার এক্সপ্রেস ট্রেনটা একটু অভাগা গাড়ী। দেরী করে ছাড়লেও সকালে বারাণসী পৌঁছে গেছে ঠিক সময়ে। কিন্তু বারাণসী স্টেশনে প্রায় এক ঘন্টা দাঁড় করিয়ে রাখল। কত দেরী করে হাওড়া স্টেশনে পৌঁছবে জানি না।

আমি বিশেষ করে শিবাজী পালের আর অনিন্দ্য বাবুর ইউটিউব চ্যানেল দেখে এবারের ট্যুর প্রোগ্রাম করেছি। অনিন্দ্যবাবু গাড়ীর জন্য দীনেশ জোশির ফোন নম্বর দিয়েছিলেন। আমি প্রায় তিনমাস আগে ট্রেনের টিকিট কেটেই দীনেশজীকে ফোন করে, আট দিনের জন্য গাড়ী বুক করেছিলাম। প্রতিদিন তিন হাজার টাকা করে। ড্রাইভার এর থাকা খাওয়ার দায়িত্ব ওদের। ভালো গাড়ী পেয়েছি। হোটেল সবই Make My Trip আর Go ibibo এর মাধ্যমে নেওয়া। আমার খরচের হিসাব অনুযায়ী ঠিকঠাকই হোটেল পেয়েছি। আমাদের খাওয়া

দাওয়া খুবই সংক্ষিপ্ত। তাই বাইরের তেল মশলা দেওয়া রান্না আমাদের জন্য একটি সমস্যা। এ ছাড়া বেড়ানোর কোন অসুবিধা হয়নি।



Nainital

Lake.

আসাম শিলং ভ্রমণ ( ২০২৩ )

আজন্ম শুনে এসেছি কুন্ডু স্পেশাল এর নাম। এই প্রায় বৃদ্ধ বয়সে এসে ওদের সাথে বেড়াতে যাওয়ার যোগাযোগ হল। আসাম আর মেঘালয় ঘুরে এলাম। 2023 এপ্রিল মাসের ছয় তারিখ সকালে কোলকাতা বিমান বন্দর থেকে প্লেনে চড়লাম। এক ঘণ্টার কম সময়ে গুয়াহাটি পৌঁছে গেলাম। গুয়াহাটি বিমান বন্দর এর বাইরে কুণ্ডু স্পেশাল এর লোকজন অপেক্ষা করছিলেন। আমরা প্রায় তিরিশ জন এসে পৌঁছতে তিরিশ পয়টিরিশ মিনিট লাগল। ওদের লোকই আমাদের বড় ব্যাগ গুলি ওদের ভাড়া করা মিনি বাসে তুলল। তিনটি ট্রাভেলার মিনি বাস আমাদের হোটেলে পৌঁছে দিল, ঘণ্টা খানেক সময় লাগল। কুণ্ডুর লোক আমাদের সকলকে চা দিল। পরে জানলাম , ওদের চারজন রান্নার লোক আর একজন ম্যানেজার আগের দিন ট্রেনে পৌঁছে গেছেন। পৌঁছানোর এক ঘণ্টা পর হোটেলের খাওয়ার জায়গায় আমরা সবাই খেতে নামলাম। কুণ্ডুর লোকই রান্না করেছিল। পরের সাতদিন চার বেলার খাওয়া ইত্যাদি সবই এরাই ব্যবস্থা করে।

দুপুরে খাওয়ার পর এক দেড় ঘণ্টা বিশ্রাম এর পর আবার সবাই দল বেধে নিচে নামলাম। সেই তিনটি মিনি বসেই চললাম বশিষ্ঠ আশ্রম দেখতে।

গুয়াহাটি শহরের এক প্রান্তে বশিষ্ঠ আশ্রম। আমরা পৌঁছলাম সূর্য ডোবার পর, সন্ধ্যা হয়ে আসছে তখন। পাহাড়ের কুড়িটা মত সিঁড়ি বেয়ে মন্দিরে উঠলাম। ছোট পুরাতন মন্দির, ভেতরে কোন বিগ্রহ নেই। একটা তেল সিঁদুর মাথিয়ে রাখা বড় পাথরের কাছে একজন পুরোহিত বসেছিলেন। মন্দিরের পিছন দিকে পাহাড় থেকে একটা ঝর্ণা ধারা পাথরের খাঁজে খাঁজে নেমে আসছে। পর্যটকেরা অনেকে সেখানে ছবি তুলছে দেখলাম। ঐ ঝর্ণার পাশ দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে আর এক দিক দিয়ে বেরিয়ে এলাম। গাড়ী যেদিকে রাখা হয়েছিল সেদিকে কয়েকটা চায়ের দোকান দেখে এগিয়ে গেলাম। মাটির গ্লাসে চা খেলাম, কুড়ি টাকা দাম। পরে অবশ্য ওদিকে যেখানেই চা খেয়েছি, কাগজের কাপেও কুড়ি টাকা। সন্ধ্যার পর হোটেলে ফিরেই কুণ্ডুর লোক তেলে ভাজা আর চা দিয়েছিল।



বশিষ্ঠ আশ্রম থেকে গেলাম শহরের ভেতরে বালাজী মন্দিরে। অনেকখানি ছড়ানো ছিটানো জায়গা নিয়ে তিনটি দক্ষিণ ভারতীয় মন্দির।

রাতের খাওয়া হল হোটেলের খাওয়ার ঘরে, রান্না আর পরিবেশন কুপুুর লোকের। রাতের খাওয়ার সময়ই পরের দিনের ভ্রমণ সূচী জানিয়ে দেওয়া হল। ভোরে উঠে গরম জলে স্নান করে কামাখ্যা মন্দির দর্শনের জন্য রওয়ানা হলাম। ভোরে ফাঁকা রাস্তায় মন্দিরে পৌঁছতে আধ ঘন্টা মত লাগল। বাস থেকে নামার সাথে সাথেই কুপুুর লোক সকলের হাতে হাতে একটা করে মজবুত ব্যাগে , সকালের প্রাতরাশের প্যাকেট দিয়ে দিল। ৭ই এপ্রিল সকালে গুয়াহাটি তে জল গরম করে স্নান করতে হয়েছে, ভাবা যায়।

সকাল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ কামাখ্যা মন্দির চত্তরে ঢুকলাম। ঢুকেই দেখি একটা লম্বা লাইন। জানলাম , ওটাই ভি আই পি টিকিট কাটার লাইন। আন্দাজে মনে হল পাঁচ সাতশ লোকের পিছনে আমরা দাঁড়িয়েছি। সকালে টিকিট দেবে দুশো জনকে। কুপুুর টুর ম্যানেজার দুজন এদিক ওদিক ঘুরে, পাল্লা ধরে কিছু করা যায় কি না চেষ্টা করে গেল। ঘন্টা দেড়েক লাইনে দাঁড়ানোর পর জানা গেল, দুশো টিকিট শেষ। বহু লোক লাইন ছেড়ে চলে গেল। আমাদের ম্যানেজার বলল, লাইন ছাড়বেন না, বারোটোর পর আবার টিকিট দেবে। আমি মিনিট পনের পরে ম্যানেজার কে জানিয়ে দিলাম, আমার ও ভাবে মন্দিরে ঢোকার দরকার নেই। আমার স্ত্রী আরও অনেকের সাথে লাইনে দাঁড়িয়ে রইল। এবার একে একে প্রায় সবাই পাশের পাথরের বসার জায়গায় বসে প্রাতরাশের প্যাকেট খুলে খেয়ে নিলাম। আমি এবার একা একাই মন্দির চত্তর ঘুরে ঘুরে দেখতে থাকলাম। এক সময় দেখলাম , পাশের একটা দরজা দিয়ে অনেকেই মন্দিরের ভেতরে যাচ্ছে, আমিও অনেক ভেতরে গিয়ে দেখে এলাম। পরে জানলাম , মন্দিরের গর্ভ গৃহ ছাড়া সবই দেখেছি। ক্রমে ক্রমে মন্দির চত্তর মেলার মত ভিড় হয়ে গেল। গেটের বাইরে বেরিয়ে একটা গলির ভেতর দোকানে চা খেলাম। ঐ গলি দিয়ে কিছুটা উপরে গিয়ে মন্দিরে ঢোকার সাধারণ লাইনটা ও দেখে এলাম।



বেলা এগারোটা নাগাদ মনে পড়ল , একটা বইতে পড়েছিলাম, ভুবনেশ্বরী মন্দিরের কথা। দু চার জনকে জিজ্ঞেস করে রাস্তাটা জেনে নিলাম। দু একটা সাইন বোর্ড ও চোখে পড়ল। খাড়া পাহাড়ী গলি ধরে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগলাম। প্রায় পাঁচশ সিঁড়ি ভেঙ্গে একটা পিচ ঢালা পাহাড়ী রাস্তা পেলাম। ডান দিকে একটা ভিউ পয়েন্ট তৈরী করা আছে। গোটা দশ বারো সিঁড়ি বেয়ে উঠলাম। নিচে অনেক দূরে গুয়াহাটি শহরের বাড়ী ঘর দেখতে পেলাম। ঐ পিচ ঢালা রাস্তার একটু উপরে ভিআইপি পার্কিং। কিন্তু কোন মন্দির দেখা যায় না। একজন লোক উপর থেকে নেমে আসছিল, তাকে জিজ্ঞেস করে জানলাম, মন্দির আরও উপরে। চড়াই রাস্তায় আরও প্রায় একশ ফুট ওপরে উঠতে হল। এবার দেখলাম একটা সিমেন্টের নতুন তোরণ দ্বার। তার ভেতর দিয়ে আরও তিরিশটি মত সিঁড়ি ভেঙ্গে মন্দির চত্তরে পৌঁছলাম। ছোট্ট সুন্দর মন্দির। আমি ছাড়া আর দুজন মাত্র যাত্রী। খুবই নির্জন পরিবেশে একটু এদিক ওদিক ঘুরে এলাম। মন্দিরের পিছন দিকে গিয়ে দেখলাম, অনেক নিচে ব্রহ্মপুত্র নদী। মাঝে মাঝেই চড়া দেখা যাচ্ছে। দূরে গুয়াহাটি শহর ও দেখা যায়। কয়েকটা ছবি তুলে নেমে এলাম কামাখ্যা মন্দির চত্তরে।



ওখানে আমাদের দলের সবাই ভিআইপি টিকিটের জন্য অপেক্ষা করছে। প্রায় পৌনে একটার পর ওরা সকলে পূজার লাইনে চুকে গেলে আমি আবার নিজের মত ঘুরতে শুরু করলাম। ওদের পূজা দিয়ে বেরোতে চারটা পেরিয়ে যাবে শুনলাম। আমার স্ত্রী কে বললাম, আমি উমানন্দ দেখে হোটেলে চলে যাচ্ছি। মন্দির এলাকা থেকে বেরিয়ে একটু নিচে নেমে দেখি অনেক লোক লাইন দিয়ে ভান্ডারায় প্রসাদ খেতে চুকেছে; আমিও চুকে পড়লাম। কয়েকশ লোক একসাথে স্টিলের থালায় খিঁচুড়ি নিয়ে খেলাম। ওখান থেকে বেরিয়ে বাস অটো যেখানে দাঁড়ায় সেদিকে চললাম। এমন সময় আমাদের এক ম্যানেজার মোবাইলে ফোন করে বলল, সকলে খেতে বেরোচ্ছে আমি ভান্ডারায় খেয়ে নিয়েছি জানালাম। আরও জানালাম আমি উমানন্দ দেখতে যাচ্ছি। পাশ থেকে এক অটো রিক্সা চালক শুনতে পেয়ে বলল, আমি অটো রিক্সা নিয়ে যাচ্ছি, চলুন। ওর আরও দুজন যাত্রী ছিল, তাদের সাথে আমাকেও উমানন্দের ঘাটে পৌঁছে দিল। সাথে সাথেই টিকিট কেটে লঞ্চে উঠলাম। মাত্র মিনিট দশেকই উমানন্দ ঘাটে পৌঁছে দিল লঞ্চ। ঘাট থেকেই খাড়া সিঁড়ি উঠে গেছে মন্দির চত্বরে। অন্তত দুশো সিঁড়ি বেয়ে উঠলাম। পাহাড়ের মাথায় একটা ভলি বল খেলার মাঠের মত জায়গা। তাতেই তিনটি ছোট ছোট মন্দির। পূজা দেওয়ার জন্য জনা পঞ্চাশেক লোকের লাইন পড়েছে। আমি আর পূজার লাইনে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলাম না। নিচে লঞ্চ ঘাটে নেমে এলাম। কয়েক মিনিটের মধ্যেই লঞ্চ ছেড়ে দিল। এপারে ফিরে এসে আবার সেই আগের অটো রিক্সা ই পেলাম। বিকেল পৌনে চারটার দিকে হোটেলে ফিরে এলাম। আমাদের দলের সবাই ফিরল প্রায় ছয় টা নাগাদ। স্ত্রীর কাছে জানলাম, ওদের আর উমানন্দে যাওয়া হয় নি। সারাদিনের ধকলের পর আমার স্ত্রী আর বেরোতে চাইল না। আমি একাই বেরিয়ে পল্টন বাজারে আধ ঘন্টা মত ঘুরে এলাম।

নিয়ম মত রাত্রে খাওয়ার সময় ম্যানেজার জানিয়ে দিল পরের দিন কখন রওনা দিয়ে কোথায় যাওয়া হবে। সকাল সাড়ে সাতটায় রওনা দিয়ে যাওয়া হবে কাজিরাঙ্গা। আড়াইশো কিলোমিটার মত রাস্তা। আমরা যাবো সেই তিনটি ট্রাভেলার মিনি বাসে। পুরো লটবহর যাবে। তাই আমাদের বড় স্যুটকেসগুলি কুণ্ডুর লোক আর হোটেলের ছেলেরা মিলে এক ঘন্টা আগেই বাসে তুলল। আমরা প্রাতরাশ করে বাসে উঠলাম। বাস ছাড়ার সাথে সাথেই কুণ্ডুর একজন লোক আমাদের একটা করে লজেন্স চকলেট এর প্যাকেট দিল। মিনিট কুড়ি শহরের রাস্তায় চলার পর আমরা শহর ছাড়িয়ে হাই ওয়ে তে চলতে শুরু করলাম। রাস্তার পাশের বাড়ী ঘর, চাষের জমি আমাদের বাংলার মতোই।

একটানা ঘন্টা তিনেক চলার পর আমাদের গাড়িগুলি হাই ওয়ে ছেড়ে একটা সরু রাস্তায় ঢুকল। তিন কিলোমিটার মত চলে একটা মন্দিরের কাছে মাঠে গিয়ে দাঁড়ানো হল। মন্দিরটি ঠিক একটি শিব লিঙ্গের আকার। দোতলা মন্দিরটি চল্লিশ ফুট মত উচু হবে। বেশ রোদ ছিল, আমাদের ছাতা স্যুটকেসে, তাই রোদের মধ্যেই ধুধু প্রান্তরের মাঝে মন্দির দেখতে গেল সকলে। আমার আর মন্দিরে ঢোকানোর আগ্রহ ছিল না। দূর থেকেই দু একটা ছবি তুলে একটা চায়ের দোকানে বসলাম। ভালো কথা, মন্দিরটির নাম শুনলাম মহা মৃত্যুঞ্জয় মন্দির। আবার সেই তিন কিলোমিটার ফিরে হাই ওয়ে ধরলাম।



ঘন্টা দেড়েক চলবার পর একটা জায়গায় থামা হল। এক ম্যানেজার আর একজনকে নিয়ে রাস্তার পাশের বড় ধাবায় ঢুকল। দু চার মিনিট পরই সকলকে নামতে বলল। হাই ওয়ে র পাশের ধাবা বললে আমরা যা বুঝি এটা সেরকম নয়। সামনে বিরাট রেস্টুরেন্ট। পিছনে বাগানের মধ্যে আবার খড়ে ছাওয়া বসার জায়গা। আমরা সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসলাম। কুপুর লোক বাগানের পাশে একটা শেডের তলায় থাওয়ার গরম করে নিল। আধ ঘন্টার মধ্যেই আমাদের মাছের ঝোল ভাত দিয়ে দিল। সবার থাওয়া হলে ওরা নিজেরা খেয়ে, বাসনপত্র ধুয়ে বেঁধে বাসে তুলল। সব মিলে ঘন্টা দেড়েক। আবার বাস ছাড়লে সকলকে একটা করে উপকানা র প্যাকেট দিল। ঘন্টা দেড়েক চলার পর কাজীরঙ্গা জঙ্গলের এলাকার মধ্যে দিয়ে বাস রাস্তা চলল। সে এক সুন্দর অভিজ্ঞতা; পরে লিখব।

## কাজিরঙ্গা ভ্রমণ

হাইওয়ে ধরে চলতে চলতে মাঝে মাঝে বড় সাইন বোর্ড দেখতে পেলাম, লেখা, জঙ্গলের প্রাণীদের পারাপারের জায়গা, গাড়ী আস্তে চালান। ওসব জায়গায় রাস্তার পাশের জঙ্গল বেশ ঘন। এক জায়গায় আমাদের গাড়ী থেমে গেল, ড্রাইভার বাম দিকে মাঠের মধ্যে একটি গণ্ডার দেখাল। সবাই বেশ উত্তেজিত; সকলেই মোবাইলে ছবি তুলেছিলাম। আমাদের সামনের গাড়ীর কয়েকজন নেমে রাস্তার পাশে গিয়ে ছবি তুলল। ওখান থেকে কাজিরঙ্গা জঙ্গলে ঢোকান মূল রাস্তাটি প্রায় দশ কিলোমিটার। আবার একটু এগোনোর পর বা দিকে মাঠের মধ্যে দুটি হাতি দেখতে পেলাম। তারপর আবার এক জায়গায় একটি বাঘা সহ মা গণ্ডার। এসবই বাস রাস্তা থেকে একশ মিটার মত দূরে। পরে পাঁচ শ মিটার মত দূরে আরও দুই একটা গণ্ডার দেখলাম। এই ভাবে কখনও জোরে কখনও আস্তে চলে আমাদের গাড়ী রিসোর্ট এ পৌঁছাল প্রায় বিকাল সাড়ে চারটে নাগাদ। খুব ছড়ানো ছিটানো জায়গা নিয়ে রিসোর্ট এর কটেজ গুলি। আমাদের কটেজ এর চাবি দিয়ে দিল, নিজেরাই এক একটি কটেজ খুলে ঢুকলাম। মিনিট দশেকের মধ্যে আমাদের স্যুটকেস কটেজে পৌঁছে গেল। ঘন্টা থানেকের মধ্যেই তেলভাজা আর চা এসেগেল। সন্ধ্যার মুখে আমরা এক এক করে বেরিয়ে রিসোর্টের বিরাট এলাকার মধ্যে ঘুরে দেখতে লাগলাম। একটা ফুটবল মাঠের মত জায়গার এক পাশে বেশ কিছু ছেলে মেয়ে বিছা নাচ এর মহড়া দিচ্ছিল, আমরা দেখলাম। রাত নটার পরই কুপুর্ন লোক খাওয়ার জায়গায় সকলকে ডেকে নিয়ে গেল। রাতের খাওয়ার সময় ই ম্যানেজার জানিয়ে দিল, পরদিন সকাল আটটায় জঙ্গল সাফারী করার জন্য রিসোর্টের সামনে জীপ এ উঠতে হবে।

কাজিরঙ্গা তেও সকালে জল গরম করে স্নান করতে হল। সকালেই টি ভি র খবরে দেখলাম, কলকাতায় তাপপ্রবাহ চলছে। খোলা জিপে জঙ্গলে ঘুরতে হবে বলে কেউ কেউ ছাতা নিয়ে উঠলো, কোথাও ছাতা মাথায় দিতে হয়নি।

জীপে ওঠার আগে মাথাপিছু ছয়শ টাকা করে ম্যানেজারকে দিলাম। প্রতিটা জীপে ছয় জন করে বসার ব্যবস্থা। অন্যান্য জাতীয় অভ্যারণ্যে জীপে একজন করে গাইড থাকে, এখানে ড্রাইভারই গাইড। পরিচয় পত্র ও কেউ দেখতে চাইল না। রিসোর্ট থেকে মিনিট দশেকের মধ্যে আমাদের জীপগুলি চেক পোস্ট এ পৌঁছে গেল। অন্তত পঁচিশ তিরিশটি জীপের লাইন পড়ল। রাস্তার ডানদিকে নিচে একটা মাঠের মধ্যে গোটা পনের গাড়ী পার্কিং করা আছে দেখলাম। পরে জানলাম যারা হাতীর পিঠে সাফারী করতে গিয়েছে, তাদের গাড়ী ও গুলি। মিনিট দশ পনের লাগল আমাদের দলের কাগপত্রগুলো ঠিক করতে। তার পর জীপ চলল। চেক পোস্ট এ ভালো করে পরীক্ষা করা হয়েছিল, কারও কাছে কোন খাওয়ার আছে কি না। একশ গজ মত ঢুকেই দেখি বাম দিকের মাঠের থেকে দুটি হাতী আসছে, তাদের পিঠে দুজন যাত্রী আর মাছত। ওদিকের মাঠেই, রাস্তা থেকে তিন চারশ মিটার দূরে দুটি গণ্ডার চরে বেড়াচ্ছে। রাস্তার ডান দিকে একটা বাঁধানো প্ল্যাটফর্ম, ওখানে আরও চার পাঁচটি হাতী। লোকজন ঐ প্ল্যাটফর্ম এ সিঁড়ি বেয়ে উঠে, হাতীর পিঠে চাপছে।

আমাদের জিপগুলি মাঠের ভেতরের আঁকা বাঁকা রাস্তা দিয়ে ধীরে ধীরে চলল। রাস্তার পাশে দু দিকেই মাঠ, জলা জমি। বেশীর ভাগই আট দশ ফুট উঁচু ঘাসের জঙ্গল। বড় গাছের গভীর জঙ্গল খুবই কম। মাঝে মাঝেই জলার ধারে একটি দুটি করে গণ্ডার, হাতী, হরিণ দেখতে থাকলাম। সবাই মোবাইলে ছবি তুলতে থাকলাম। কোথাও কোথাও চার পাঁচটা হাতীর দল, বুনো মহিষের দলও দেখলাম। একটা কাঠের সাঁকো র নিচে একটা বড় শোল মাছ অনেকক্ষণ এক জায়গায় থেকে আমাদের দর্শন দিল। কয়েকটা বুনো শস্যোর, একটা কচ্ছপ আর একটা মাছরাঙা পাখি দেখলাম। এই জঙ্গলে পাখী বিশেষ দেখলাম না। একটা লম্বা জলার এক পাশে, ফাঁকা মাঠে চারটি বাঘা নিয়ে চারটি মা হাতী, তাদের কাছেই দুটি গণ্ডার চরতে দেখে প্রায় সবকটি জীপ দাড়িয়ে গেল। আমরা প্রচুর ছবি তুললাম। ঐ জলার উল্টো দিকে একটা ফাঁকা মাঠে একটি ওয়াচ টাওয়ার। অনেকে উঠে দেখছে। আমাদের গাড়ীর একজনও টাওয়ার ঘুরে এলেন। আমার আর নামার ইচ্ছা হল না। আসলে এর মধ্যেই এত বেশী বন্য প্রাণী দেখে নিয়েছি যে নতুন আর কিছু দেখার আগ্রহ ছিল না। জীপ গাড়ী ঘন্টা দুই সময় আমাদের প্রায় আট দশ কিলোমিটার ঘুরিয়ে এনেছে। সাড়ে দশটা এগারোটা নাগাদ রিসোর্টে ফিরে এলাম। আমাদের দলের সবাই প্রচুর বন্য প্রাণী দেখে খুব খুশী।

## Kaziranga National Park



বিকেলে তিনটে নাগাদ আবার মিনি বাসে করে সকলে চললাম, মাইল খানেক দূরের অর্কিড হাউস দেখতে। ওখানে গিয়েও দেখলাম গোটা তিরিশ গাড়ী করে অনেক পর্যটক পৌঁছে গেছেন। দেড়শ টাকা দিয়ে টিকিট কেটে ভেতরে ঢুকলাম। একটি সবুজ জালে ঘেরা অর্কিড হাউস অসংখ্য অর্কিড এ সাজানো। ওর উল্টো দিকে একটি ছোট মিউজিয়াম। আসামের , বিশেষ করে উপ জাতীয় লোকদের তৈরী নানান রকমের জিনিস দিয়ে সাজানো। পাশেই একটি বাড়িতে নানান রকমের বাদ্য যন্ত্র দিয়ে মিউজিয়াম করা হয়েছে। একজন শিল্পী প্রতিটা বাদ্য যন্ত্র বাজিয়ে, গান গেয়ে সব বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। একটা মুক্ত মঞ্চ মত চালায় বেশ কিছু শিল্পী বিহ নাচ গান করে দেখলেন। ঐ মঞ্চে সন্ধ্যে সাড়ে ছয় টা থেকে সাড়ে আটটা অনেক অনুষ্ঠান হয়। তার জন্য পরে আবার টিকিট কেটে ঢুকতে হয়; আমাদের দেখা হয়নি। গেটের বাইরে বেশ কিছু অস্থায়ী দোকানে নানান রকম স্থানীয় জিনিস বিক্রী হচ্ছে। আমরা কলকাতায় দুপ্রাপ্য কালো চাল কিনলাম এক কেজি। মাত্র একশ টাকা দিয়ে।

পরদিন সকালে আবার সবার স্যুটকেস আগেই বাসে তুলল কুণ্ডুর লোক আর হোটেলের ছেলেরা। আটটা নাগাদ বাস তিনটি ছাড়ল। এবারে আমাদের গন্তব্য সোজা শিলং শহর। ফেরার পথেও রাস্তার পাশের মাঠে সাত আটটা গণ্ডার দেখলাম। আমরা গোটা ছয়েক জাতীয় অভয়ারণ্যে সাফারী করেছি, এত সংখ্যায় বন্য প্রাণী কোথাও দেখিনি। কোলকাতা থেকে প্লেনে বা ট্রেনে গুয়াহাটি পৌঁছে ঐ দিনই আড়াইশ কিমি দূরে কাজিরাংগা চলে যাওয়া যায়। ওখানে অনেক হোটেল। পরদিন সকালে সাফারী করে ঐ দিন ই গুয়াহাটি ফেরা যায়। গুয়াহাটি থেকে জোরহাট অনেক বাস চলে, তাতে করেও কাজীরাঙ্গা যাওয়া যায়।



শিলং

কাজীরাঙ্গা থেকে আমাদের তিনটি মিনি বাস সকাল আটটায় রওনা দিল শিলং শহর এর উদ্দেশ্যে। গুয়াহাটি থেকে যে রাস্তা দিয়ে গেছলাম, সেই রাস্তা ধরেই ফেরা। শুধু গুয়াহাটি শহরে না চুকে এক পাশ দিয়ে চলে যাওয়া। ফেরার পথে বিশেষ কিছু ঘটনা ঘটেনি। ঘন্টা দুই চলার পর বড় রাস্তার পাশে অনেক ডাব বিক্রী হচ্ছে দেখে নামা হল। এক বুড়িমা ডাব বিক্রী করছিলেন। আমার আগে মুখার্জীবাবু দাম জেনে ডাব কেটে দিতে বলেছেন; দাম জানলাম তিরিশ টাকা। আমিও একটা কেটে দিতে বললাম। মুখার্জী বাবু একটা একশ টাকার নোট দিলে বুড়িমা চল্লিশ টাকা ফেরৎ দিলেন। তাই নিয়ে অশান্তি। বুড়িমা বারবারই বলছেন দাম শাটি টাকা। আর মুখার্জী বাবু বুঝছেন খাটি টাকা। আমি বুঝে গেলাম শাটি মানে উনি ষাট বলছেন। আবার একটা বড় ধাবায় দুপুরের খাওয়া হল। তারপর একটানা ঘন্টা চারেক চলে শিলং শহর। গুয়াহাটি থেকে এক ঘন্টা মত চলার পর পাহাড়ী রাস্তা শুরু হল। আকাবাঁকা রাস্তা ক্রমশ উপরে উঠতে থাকল। এক জায়গায় না থেমেই ডান দিকে দেখতে বলল ড্রাইভার। দেখলাম একটা নদীর মত; ড্রাইভার বলল, বড়া পানী লেক। পরে জেনেছি ওর নাম উমিয়াং লেক। অনেকে ওখানে বোটিং ও করে। শিলং শহর এর রাস্তা বেশ সরু, গাড়িও প্রচুর। শহরে চুকে আমাদের হোটেলে পৌঁছতে ঘন্টা খানেক লাগল। সন্ধ্যায় আর কোথাও বেরলাম না। পাহাড়ী শহর হিসেবে যেমন ঠান্ডা লাগবে ভেবেছিলাম তেমন ঠান্ডা ছিল না। রাত্রে ডিনার হলেও সোয়েটার লাগলো না। ভোরের উঠে রাস্তায় হাটতে বেরোনোর সময় সোয়েটার গায়ে বেরোলাম, কিন্তু আট টায় আর সোয়েটার গায়ে রাখা গেল না।

শিলং এর দ্বিতীয় দিনে আমরা চেরাপুঞ্জি পর্যন্ত দেখে এলাম। সকাল আটটায় বাস ছাড়ল। শহরের রাস্তায় এই সকালেই গাড়ীর জ্যাম। আমরা সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ শিলং এর ঠাকুর বাড়ী পৌঁছে গেলাম। একশ বছর আগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই বাড়ীতে ছিলেন। এখন সেই বাড়ীতে একটি ছোট মিউজিয়াম হয়েছে। অত সকালে মিউজিয়াম খোলা ছিল না। বাড়ীর সামনে কবির পূর্ণাবয়ব মূর্তি; সবাই সেখানে ছবি তুলেছিলাম। তারপর গাড়ী চলল চেরাপুঞ্জির পথে। গোটাটাই আঁকাবাঁকা পাহাড়ী রাস্তা। আমরা ঘন্টা তিনেক চলে পৌঁছলাম, নৌয়াকালিকাই জলপ্রপাতের কাছে। ধু ধু প্রান্তরের মধ্যে দেড়শ মিটার মত হেঁটে ভিউ পয়েন্ট। অনেক ওপর থেকে জলপ্রপাত দেখলাম। সকল ভ্রমণ স্থানের মত এখানেও বেশ কিছু অস্বাভী দোকানে স্থানীয় জিনিস বিক্রী হচ্ছে। আমরা দারচিনি কিনলাম। ফেরার পথে পাশেই সোহরা রামকৃষ্ণ মিশনের বিরাট এলাকা। আমরা সবাই নেমে স্কুল আর মন্দির দেখে এলাম। এই মিশন ১৯৩১ সালে তৈরী। অতদিন আগে ঐ দুর্গম জায়গায় এই মিশন স্থাপন করা হয়েছে ভাবলে রোমাঞ্চ বোধ হয়। এক মহারাজের ভাষণে শুনেছি, চল্লিশ পঞ্চাশ বছর আগে, সপ্তাহে একবার জীপ গাড়ী নিয়ে গৌহাটি শহরে বাজার করতে আসা হত।



এরপর আমরা পৌঁছলাম একটা গুহার কাছে। টিকিট কেটে গুহার একদিক দিয়ে চুকে আর এক দিক দিয়ে বেরোলাম। একশ পঁয়ত্রিশ মিটার রাস্তা, বেশ রোমাঞ্চকর। ভেতরটা বেশ আঁকাবাঁকা। এক এক জায়গায় একটু অসাবধান হলেই মাথায় ঠোঁকর লাগার সম্ভাবনা। আমাদের দলের চার পাঁচ জনই গুহায় চুকে অন্য দিক দিয়ে বেড়িয়েছি। সামনে বিরাট চব্বরে গাড়ী রাখার জায়গা। বেশ কিছু গাছের তলা সিমেন্ট বাঁধানো। কুপুুর লোক আমাদের হাতে হাতে দুপুরের খাওয়ার প্যাকেট দিল। ঐ সব বাঁধানো গাছের তলায় বসে সকলে খেয়ে নিলাম। মিনিট পনের চলার পর বড় রাস্তার পাশে এক জায়গায় বাস থামল। সবাই নেমে উল্টো দিকে সেভেন সিস্টার ফলস দেখতে গেলাম। জলপ্রপাত একেবারেই জল শূন্য। একটু বৃষ্টি হলে সাতটা ধারায় জল নামে জানলাম। আমাদের অনেকের ধারণা ছিল, চেরাপুঞ্জি তে বৃষ্টি দেখা যাবে। এপ্রিল এর এগারো তারিখ এক টুকরো মেঘ ও আকাশে ছিল না। শিলং এর অনেক কাছে এসে, বড় রাস্তা থেকে বাম দিকের ছোট রাস্তা ধরে

একটি ভেতরে ঢুকলাম। এখানে এলিফ্যান্ট ফলস জলপ্রপাত। তিনটি ধাপে জলপ্রপাত। এখানে বেশ জল ছিল। এক এক করে আমরা একেবারে নিচে পর্যন্ত নেমে দেখে এলাম। ওঠার সময় গুণে দেখলাম, একশ ছিয়াশি সিঁড়ি। ওখান থেকে সোজা শিলং এর হোটেলে ফিরে এলাম। শহরে সকালের থেকে বেশী জ্যাম, হোটেলে পৌঁছতে বিকাল পাঁচ টা বেজে গেল। আমাদের দলের কয়েকজন ট্যাক্সি নিয়ে পুলিশ বাজার ঘুরতে গেলেন, আমার উৎসাহ ছিল না।



পরদিন সকালে উঠে আমরা হোটেল থেকে নিচের দিকে হাঁটতে গেলাম। কিছুটা উৎসাহে নেমে আবার চড়াই রাস্তায় উঠলাম। বেশ কিছুটা হেঁটে একেবারে একটা পাহাড়ের মাথায় পৌঁছে প্রায় সমতল রাস্তা পেলাম। হাটতে হাটতে একটা বড় ফুটবল মাঠে পৌঁছে গেলাম। কিছু ছেলে ফুটবল খেলছে, অনেকে মাঠের পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। ওখান থেকে দু দিকেই পাহাড় দেখা যায়, বেশ সুন্দর দৃশ্য। দ্বিতীয় দিনে আমরা চললাম মাউলিংনন গ্রামের দিকে। এটা অনেক টা চেরাপুঞ্জি র রাস্তায় এগিয়ে চল্লিশ কিমি মত গিয়ে বাম দিকের রাস্তা ধরতে হয়। মাঝে পাঁচ কিমি মত রাস্তা খুব খারাপ। ধূ ধূ প্রান্তরের মাঝে রাস্তার পাশে একটা খুব ঝক ঝকে হোটেলের সামনে গাড়ী দাঁড়াল। সকলে হোটেলের টয়লেটে গিয়ে প্রস্রাব পায়খানা করে নিলাম। এমন বিচ্ছিন্ন জায়গায় এত সুন্দর ব্যবস্থা দেখে সকলেই প্রশংসা করলাম। এখন থেকে আরও মাইল পাঁচেক এগিয়ে, বড় রাস্তা ছেড়ে ডান দিকে বেশ সরু রাস্তায় গাড়ী ঢুকল। এই রাস্তা শুধু সরুই নয়, একেবারে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে চলল। দশ কিলোমিটার মত চলার পর আমরা মাউলিংনন গ্রামে পৌঁছলাম। গ্রামে ঢুকতে একটা চেক পোস্ট, এখানে মাথা পিছু তিরিশ টাকার টিকিট কেটে ঢুকতে হয়। একটু পাহাড়ী রাস্তা একশ গজ মত নেমে একটা বেশ ছড়ানো, পিচ ঢালা মাঠে পৌঁছল। ওখানে সবাই গাড়ী থেকে নামলাম। ঠিক দুপুর বেলা। ঝক ঝকে রোদ, কিন্তু কলকাতার মত আগুন গরম নয়। একজন ম্যানেজার জানিয়ে দিল, এক ঘন্টা গ্রাম ঘুরে আবার সেই জায়গায় ফিরে আসতে হবে। ওখানেই একটা হোটেলে দুপুরের খাবারের আয়োজন। আমরা সোজা গ্রামে ঢুকব না পিছন ফিরে ঘুরে ঢুকব তাই নিয়ে একটু টানা টানি হল। শেষে দলবেঁধে সোজাই ঢুকলাম। একটু এগিয়ে বাঁশের তৈরী ওয়াচ টাওয়ার দেখতে পেলাম। এটা আমি আগে ইউটিউবে দেখেছিলাম। ওঠার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু কোন কারণে বন্ধ ছিল। আমরা আধ ঘন্টা চল্লিশ মিনিটেই গ্রামটা ঘুরে দেখলাম। পাহাড়ের ঢালে ঢালে বাড়ী। প্রতিটি বাড়ীতেই ফুল আর পাতা বাহার এর গাছ। গ্রামটা পরিচ্ছন্ন গ্রাম বলে প্রচার পেয়েছে। আমার কিন্তু গ্রামটাকে পরিষ্কারের থেকেও সুন্দর বেশী মনে হয়েছে। গ্রামের চার্চের এলাকায় ঢুকে ঘুরে দেখলাম। ফুটবল মাঠে ঐ দুপুরের রোদেও ছেলেরা ফুটবল অনুশীলন করছিল, আমরা মাঠের পাশ দিয়ে হেঁটে অন্য দিকে গেলাম। গ্রামটাতে ঘুরে বেড়ালে ও লোকজন প্রায় দেখাই গেল না। প্রায় প্রতিটা বাড়ীতেই হোমস্টের ব্যবস্থা করেছে। একটা দোতলা বড় হোটেলও দেখলাম। গ্রাম ঘুরে এসে একটা বড় হোটেলের চালার নিচে আমরা সবাই খেয়ে নিলাম ঘন্টা খানেক পর গাড়ী ছাড়ল। মিনিট পাঁচ সাত চলেই পৌঁছে গেলাম লিভিং রুট ব্রীজের কাছে। এই গাছের শেকড় দিয়ে তৈরী সেতু একটি দর্শনীয় জিনিস বটে। একটি তিরিশ ফুট মত চওড়া ঝোরার উপর এই সেতু। মনে হল এক পাশের দুটি গাছের শিকড় দিয়েই সেতুটি তৈরী। সেতু পেরিয়ে অন্য পাড়ে গিয়ে, নিচে নেমে, নানান ভাবে অনেক ছবি তোলা হল। সেতু তৈরীর গাছ দুটিকে বট গাছের মত লাগল। হাতের কাছে একটা নতুন ডালে কিছু পাতা দেখা গেল। অনেক টা আমরা যাকে রবার গাছ বলি, সে রকম পাতা। তবে আকারে অনেক ছোট। এই সেতু দেখার জন্য আমাদের চল্লিশ টাকা করে টিকিট কেটে ঢুকতে হয়েছে। আমাদের গাড়ী অনেক টা নীচে একটা ছোট মাঠে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, তাই আমাদের বেশী হাঁটতে হয়নি। হয়তো একশ ধাপ ও নামতে হয়নি। কিন্তু আমাদের সাথে থাকা বয়স্ক লোকজন অনেকে ওখানে নামার সাহস পাননি।



**Living Root Bridge , Near Cherapunji**

ঐ দিন আর নতুন কিছু দেখা হয়নি, ঐ রুট ব্রিজ থেকেই সোজা শিলং এর হোটেলে ফিরে এলাম। পরদিন তো সকালে রওনা দিয়ে গুয়াহাটি ফিরে এসে দুপুরের প্লেন ধরে বিকেলে কলকাতা চলে এলাম। ঐ Mawlainong গ্রামের থেকে আবার চল্লিশ কিমি মত গেলে ডাউকি নামে একটি ভালো বেড়ানোর জায়গা আছে; আমাদের যাওয়া হয় নি। শিলং থেকে প্রথমদিনই চেরাপুঞ্জি গিয়ে আবার শিলং ফিরে না এসে, ঐ দিন ওদিকেই মাওলাইনোং গ্রামে গিয়ে থাকতে হত। তা হলে দ্বিতীয় দিনে ওখান থেকেই সকালে ডাউকি গিয়ে বিকেলে শিলং ফেরাটা কম পরিশ্রমের হত। সম্ভবত Mawlainong এ এত লোকের এক সাথে থাকার মত হোটেল না থাকায় কুণ্ডু স্পেশাল ওখানে রাতে থাকার কথা ভাবেনি। সব মিলে কুণ্ডুর ব্যবস্থাপনা ভালো। বিশেষ করে একটু বয়স্ক লোকজন এর জন্য তো আদর্শ। আর ওদের সাথে যেহেতু বাঙালি রান্নার লোক আর সরঞ্জাম যায়, খাওয়া নিয়ে কোন সমস্যা হয় না। কিন্তু পাঁচ ছয় মাস আগে থেকেই ট্যুর বুক করাটা সবার কাছে বাস্তব সম্মত না ও হতে পারে।

## কাশ্মীর ভ্রমণ ( October 2024)

বাঙালি মাত্রেই একবার কাশ্মীর ভ্রমণের স্বপ্ন দেখে। আমিও অনেক বছরই ভেবেছি। আমার কোন কোন বন্ধু তিনবারও ঘুরে এসেছে। গত বছর দুই অনেক ইউটিউবের ভিডিও দেখে কাশ্মীর নিয়ে আগ্রহ আরও বেড়েছে। চাকরী থেকে অবসর নিয়ে এবার শুধু দেশের বেড়ানোর জায়গাগুলি ঘুরে বেড়াবো, এরকম ভেবে রেখেছি। ইউটিউবে দেখে দেখে কোন সময় কাশ্মীর যাওয়া যায় তাই নিয়ে বেশ চাপে পড়তে হল। আমার একটা বিশেষ ইচ্ছা হল, আপেল বাগানে আপেল পেকে আছে, সেই সুন্দর দৃশ্য দেখতে হবে। পূজার সময় আপেল পাকে, এই খবরটা পেলাম। তাই ঠিক করলাম, পূজার সময়ই যাবো। মেয়েকে সাথে নিতে হলে পূজার সময় ঠিক হবে না, পূজার পর পরই যেতে হবে। এরপর ঠিক করতে হবে, প্লেনে করে যাব না , ট্রেনে।



এখন তো হাতে অটেল সময়। হুশ করে প্লেনে করে গিয়ে আবার উড়ে ফিরে আসার দরকার কি! ট্রেনে গেলে জানালা দিয়ে মার্চ ঘাট দেখতে দেখতে যেতে পারি। ট্রেনের খবর খুব সুবিধার নয়। এদিক থেকে জম্মু তাওয়াই যাওয়ার দুটি মাত্র ট্রেন; দু রাত ট্রেনের মধ্যে বসে থাকা। তারপর দুশো কিমি গাড়ী করে যাওয়া , বেশ ঝামেলার ব্যাপার। আর একটা রাস্তা আছে, দিল্লি থেকে আর একটা ট্রেন ধরে কাটরা যাওয়া যায়। এতে গাড়ীর রাস্তা চল্লিশ কিমি কমবে। তাছাড়া আমার অনেকদিনের একটা ইচ্ছা পূরণ করা যায়। ট্রেনের সময় সূচি দেখে বুঝলাম, রাজধানী ধরে গেলে সেই দিন সন্ধ্যার ট্রেনে দিল্লী থেকে কাটরা যাওয়া যাবে। পূজার ছুটির সময় ট্রেনের টিকিট কাটতে হলে, একশ কুড়ি দিন আগেই কাটতে হবে। ক্যালেন্ডার দেখে ঠিক ঐ একশ কুড়ি দিন আগের তারিখটা দেখে রাখলাম। ( তারপর তো এটা ৬০ দিন হয়ে গেল) কিন্তু ঐ তারিখটাতেই আমাদের ভিমতালে থাকার কথা। মোবাইলেই টিকিট কাটতে হবে। সাথে মেয়েকেও বলে রাখলাম, আমার কোন সমস্যা হলে ও যাতে বাড়ীতে বসে ল্যাপটপে টিকিট কাটতে পারে। এইবারই প্রথম, একেবারে টিকিট দেওয়া শুরু হওয়ার পনের মিনিটের মধ্যেই টিকিট কাটতে পারলাম। ঐ দিন দুপুর সাড়ে এগারোটায় সব টিকিট বিক্রী হয়ে,ওয়েটিং লিস্ট শুরু হয়েছে দেখেছিলাম। পরদিনই দিল্লী থেকে কাটরা ট্রেনের টিকিটও কেটেছিলাম। ফেরার ব্যবস্থাও ঐ একই রাস্তায়। এসব খবর কিন্তু চার মাস আগের। এর মধ্যে রাঁচি ভ্রমণ করে এসেছি। আবার ডিসেম্বর মাসে মধ্য প্রদেশ ভ্রমণের জন্য টিকিট কেটে নিলাম।

রাজধানীতে প্রথম ভ্রমণের খবর আগেই লিখেছি। রাজধানী দিল্লী পৌঁছয় এগারোটা নাগাদ, কাটরা ট্রেনের সময় সন্ধ্যা সাতটা পাঁচ এ। দিল্লিতে এসে ঘন্টা সাত আট বসে থাকতে হবে। তাই ট্রেনের টিকিট কেনার সাথে সাথেই

রিটারিং রুমও বুক করলাম। এদের আবার নানান রকম ভিরকুটি আছে। সকাল আটটা থেকে সন্ধ্যা আটটা , চাইলেও বুকিং হল না। কিন্তু আগের দিন সন্ধ্যা আটটা থেকে ২৪ ঘন্টার জন্য বুকিং পেলাম। রাজধানী এক্সপ্রেস দিল্লী পৌঁছল দশটা পঞ্চাশ-এ। প্ল্যাটফর্মে নেমে খোঁজ করে জানলাম, রিটারিং রুম ষোল নম্বর প্ল্যাটফর্মে। ওদিকে গিয়ে, তিন তলায় উঠে জানলাম, ওখানেও আছে, কিন্তু আমাদের ১১৪ নং রুম এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে। আবার চলো উল্টো দিকে। খাতায় নাম লিখে চাবি নিয়ে রুমে ঢুকলাম এগারোটা পনের নাগাদ। স্নান করে দুপুরের খাবারের জন্য বেরোলাম। রেলের যে ভোজনালয় আছে, সেখানে রাজমা চাওল ছাড়া আর কিছু নেই। হেঁটে বড় রাস্তায় গেলাম। সামনের দোকানটাতেই ঢুকে পড়লাম। শুধুই ভেজ খালি আছে। তাই নিলাম। দাম দিতে গিয়ে বুঝলাম, ডাকাতের কবলে পড়েছি। যে খালীর দাম দেড়শ টাকা হলেই বেশী, তার দাম নিল সাড়ে তিনশ টাকা করে। রাতের ট্রেনে খাওয়ার জন্য রুটি তরকারী প্যাক করে নিতে আবার ঐ বাজারটাতে গেলাম। গলির ভেতর একটা দোকানে দেখলাম, স্পেশাল খালি একশ তিরিশ টাকা। মেয়ে একদিন কম ছুটি নেবে বলে আমাদের সাথে ট্রেনে আসেনি। পরদিন দুপুরে প্লেনে উঠেছে। হিসেব মত অন্তত এক ঘন্টা আগে দিল্লী স্টেশনে পৌঁছে যাওয়ার কথা। কিন্তু পৌঁছল সাড়ে ছয়টা নাগাদ। শুধু ঢুকে আমাদের রুমটা একবার দেখল। আমরা সাত নম্বর প্ল্যাটফর্মে পৌঁছনোর দশ মিনিট পর ট্রেন দিল। এই ট্রেনটা গোটাটাই রাত্রে রাত্রে; জানালার বাইরে দেখার কিছু নেই। ট্রেনে বসেও কাটরার গাড়ীর এজেন্টকে জানালাম, সকালে পৌঁছব। কাটরা পৌঁছে নতুন সিম কার্ড নিয়ে কাশ্মীর এ যেতে হবে। কিন্তু ভোরে জঙ্গু পৌঁছেই দেখলাম, মোবাইলে কোন সিগন্যাল নেই। কাটরা পৌঁছে দেখলাম, পৌনে ছ'টাতেও অন্ধকার। প্রায় সবাই প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরিয়েই বৈষ্ণুদেবী মন্দিরে যাত্রার জন্য নাম লেখাতে লাইন দিল। আমরা মন্দিরে যাব না। তাই বেরিয়ে ঠিক উল্টো দিকের দোকানে সিম কার্ড নেওয়ার জন্য দাঁড়ালাম। গোটা তিনেক লোক একটা করে টেবিল নিয়ে, দোকান নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের তিন জনের সিম কার্ড নিয়ে, এক্টিভেট করতে মিনিট পনের কুড়ি লাগল। তারপর গাড়ীর জন্য ফোন করতে পারলাম। ড্রাইভার বলল, মিনিট পনের পরে আসছে। আমরা ঐ ট্রাভেল এজেন্সির দোকানে বসে চা খেলাম। সাতটার আগেই গাড়ী এসে গেল। ঠিক মত আলো ফুটতে প্রায় পৌনে সাতটা বেজেছিল।

## Katra Rail Stn. And Outside



ড্রাইভার জানাল, শ্রীনগর পৌঁছতে সাত ঘন্টা লাগবে। সুন্দর রাস্তা ধরে চলল গাড়ী। দেড় ঘন্টার মত চলে রাস্তার পাশের একটা দোকানে প্রাতরাশ করতে থামলাম। পাহাড়ী রাস্তা, পাশে পাশে চলল চেনাব নদী। সাড়ে এগারোটায় একটা দোকানে চা খেতে বসলাম। দোকানদার বলল, এরপর ভালো রাস্তা, দু ঘন্টায় পৌঁছে যাবেন। রাস্তা বেশ ভালো। কিন্তু কয়েক কিলমিটার পরই জ্যামে পড়লাম। বানীহাল শহর পেরোতেই দেড়টা বেজে গেল। রাস্তার পাশের একটি হোটেলে পৌঁছে দুপুরের খাওয়ার খেয়ে নিলাম। বানীহাল পর্যন্ত গোটা তিন চার টানেল পেলাম। প্রথম টানেলটি সাড়ে নয় কিলো মিটার।



9 কিমি লম্বা টানেল

বানীহাল পেরিয়ে আধঘন্টা মতো চলার পর আবার একটা নয় কিমি টানেল পেরোলাম। তারপর থেকেই সোজা চওড়া রাস্তা। পাশে পাশে ধানের ক্ষেত। ধান কাটা হয়ে গেছে।



গাড়ী সোজা চলল হুঁ করে। এক জায়গায় শুরু হল ক্রিকেট ব্যাট তৈরীর কারখানা। রাস্তার দু পাশের প্রায় সব বাড়ীতেই ব্যাট তৈরীর কাঠ সাজানো। এরকম অন্তত তিন -চার শ বাড়ী দেখলাম। তারপর আবার শুরু হল কেশরের দোকান। শক্তিগরের ল্যাংচা দোকানের মত , মাইল চারেক ধরে চলল কেশর দোকান। হাজার খানেক। শ্রীনগর পৌঁছতে প্রায় পাঁচটা বেজে গেল। তার মানে রাস্তায় রাস্তায় দু দিনের বেশী কেটে গেল। ১৭.১০.২৪.



## কাশ্মীর ভ্রমণ 2

কাশ্মীর ভ্রমণ করতে এসে একটা দিন পথে পথে কেটে যাবে? এখানে সূর্য ডোবার সময় কলকাতার থেকে প্রায় চল্লিশ মিনিট পর। আমরা হোটেলে ঢুকে মুখ হাত ধুয়ে, একবার ডাল লেক থেকে ঘুরেই আসি, এই ভেবে বেরিয়ে পড়লাম। আমাদের হোটেল ডাল লেক থেকে দেড় কিমি দূরে। রাস্তায় একটা অটো নিলাম, একশ টাকা ভাড়া। লেকের পাড়ে হাঁটতে শুরু করতেই শিকারাওলা ছিনে জোকের মত ধরে ফেলল। অন্তত আধ ঘন্টা দিনের আলো আছে দেখে রাজী হয়ে গেলাম। বেশ দরাদরি করে , এক ঘন্টা, আটশ টাকায় রফা হল। বহু প্রতীক্ষিত ডাল লেকে শিকারা ভ্রমণ শুরু করলাম। এই ভ্রমণের জন্য কোন তিথি নক্ষত্র দেখে বেরোইনি। ঘটনাচক্রে এটা ছিল, কোজাগরী পূর্ণিমার সন্ধ্যা। আমরা ঘটনাচক্রেই ঠিক সন্ধ্যার মুখে শিকারায় উঠেছি। একটু পরেই দেখি পাহাড়ের মাথায় গোল চাঁদ উঠেছে।



বেশ কিছু ছবি তোলা হল। আমরা এ বছরের প্রথম দিকে কেরালার ব্যাক ওয়াটারে হাউস বোট এ থেকেছি। সেখানে বড় বজরা মাইলের পর মাইল জলে ঘুরে বেড়ায়। ডাল লেকের ধারে ধারে অসংখ্য হাউস বোট। এরা চলে না। তাই এতে থাকার আগ্রহ ছিল না। আমরা শিকরা থেকে দেখলাম। শিকারা চলতে শুরু করতেই ছোট ছোট ডিপ্সি নৌকা করে নানান জিনিস বিক্রী করতে পাশে পাশে চলল। আমরা একটা ডিপ্সি থেকে কাওয়া কিনে খেলাম। এটা কাশ্মীরের এক বিশেষ পানীয়। কফির থেকে দাম বেশী। আমার তেমন কিছু ভালো লাগেনি। শিকরা থেকে জলে ভাসা অনেক ছোট ছোট বালি হাঁসের মত পাখি দেখলাম। অন্ধকার হলে , সব হাউস বোট এ আলো জ্বলে উঠল।



জলের ধারে ধারে মীনা বাজার। শাল ইত্যাদির দোকান। আমরা নামিনি। ঘাটে ফিরে এসে কম বয়সের ছেলেদের কাছে চা খেলাম। সব ট্যুরিস্ট স্পট এর মত এরাও লোক ঠকাতে ওস্তাদ। চা তিরিশ টাকা বলে, দাম নেওয়ার সময় পঞ্চাশ টাকা নিয়ে নিল। এ এমন কিছু নয়। পরে আরও বড় ঠগের পাল্লায় পড়েছি। আবার একটা অটো নিয়ে ফিরে এলাম। আমাদের হোটেলের গলিতে ঢোকান আগের বড় রাস্তার পাশে প্রচুর দোকান পাট। কিন্তু সন্ধ্যার পর কোনোটাতে একটাও খন্দের দেখলাম না। শিকারার থেকেও শুধুই বাংলা ভাষায় কথা শুনলাম। এদিকের দোকানে যে দু একটা খন্দের দেখলাম, তারাও বাঙালি। ১৮.১০.২৪.



সকালে লালচকের রাস্তা

## কাশ্মীর ৩

আজ সতেরই অক্টোবর, ২০২৪। শ্রীনগরে যা কিছু দেখার আছে আজ দেখে নিতে হবে। এখানে সকলেই প্রথমে যায়, শঙ্করাচার্য মন্দিরে। এটা একটা পাহাড়ের মাথায় শিব মন্দির। শঙ্করাচার্য এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু বর্তমান মন্দিরটি ততোটা পুরনো নয়, পরের দিকে কোন রাজা পুরোনো মন্দিরটি সংস্কার করেছেন। এই মন্দিরে ওঠার সময়, পাহাড়ের মুখেই সি আর পি এফ ভালকরে পরীক্ষা করে তারপর গাড়ী ছাড়ে। পাহাড়ের পাকদলিভ বেয়ে অনেকটা উঠে যায় গাড়ী। বড় ড্রাভেলার গাড়িগুলি প্রায় এক কিমি আগেই দাঁড়িয়ে যায়। চার চাকার গাড়ী আরও পাঁচ সাত শ মিটার উঠে যায়। ওখান থেকে দু তিনশ মিটার হেঁটে এগোতে হয়। বিশেষ করে ড্রাভেলার এর যাত্রীরা অনেকে অটো করে বাকী রাস্তা ওঠে। আবার বেশ ভালো করে চেকিং হল। তারপর প্রায় চারশ সিঁড়ি উঠতে হয়।



আমরা কিছুদিন আগেই রাঁচির জলপ্রপাত দেখতে কয়েক হাজার সিঁড়ি ওঠা নামা করেছি। এখানে সিঁড়ি বেশ উচু উচু, তাই পা ধরে যায়, অনেকেই বেশ হাঁপিয়ে যাচ্ছে দেখলাম। ওপর থেকে গোটা শ্রীনগর শহর দেখা যায়। সকলেই ছবি তোলার চেষ্টা করে, আমরাও করলাম। মন্দিরে ওঠার সিঁড়ির মুখে সত্তর আশি জনের মত লাইন পড়ল। কিন্তু মিনিট পাঁচ সাত এর মধ্যে শিব লিংগ প্রদক্ষিণ করে বেরিয়ে এলাম।



এরপর গোটা পাঁচেক সুন্দর বাগান দেখা। ডাল লেকের পাড়ে পাড়ে গাড়ী চলল কয়েক কিমি। এখানে লেক বেশ চওড়া। শিকারা প্রায় নেই এদিকে। চশমে শাহী বাগান দেখার জন্য দু কিমি আগেই গাড়ী পার্কিং এ রাখতে হল। অটো নিয়ে যেতে দু'শ টাকা, ফিরতে দু 'শ টাকা। বাগানগুলি সবই মোগল আমলের। কিন্তু এখনও বেশ ভালো আছে।



সবকটা বাগানেই ঢোকান টিকিট তিরিশ টাকা। বোটানিক্যাল গার্ডেন সম্ভবত অনেক পরের। শালিমার গার্ডেনের ভেতরে বেশ কিছু মোগল আমলের স্থাপত্য ভেঙ্গে যাচ্ছে। ফোয়ারায় জল নেই। এই বাগানে বেশ কিছু পুরনো চীনার গাছ আছে। চিনার এদের গর্বের গাছ। এক একটা গাছের বয়স 375 বছরের বেশী। পরেও অনেক এরকম প্রাচীন গাছ দেখেছি। একেবারে রাস্তার মাঝে রাখা আছে বিশাল বিশাল চিনার গাছ। আমাদের এদিকে রাস্তার পাশে গাছ থাকলেই তাকে কাটা হয়। রাস্তার পাশে গাছ থাকবে কেন! সবকটা বাগান দেখা হলে হোটেলে ফিরে এলাম। সন্ধ্যা হলেই বেশ ঠাণ্ডা পড়ে যাচ্ছে, তাই আর বেরোনো হচ্ছে না।



আঠারো তারিখ সকালে বেরোলাম গুলমার্গ দেখতে। ঘণ্টা দুই আড়াই সময় লাগে। গুলমার্গ পৌঁছানোর দশ বারো কিমি আগে থেকে পাহাড়ে ওঠা শুরু। সুন্দর পাইন গাছের ছায়ায় ছায়ায় পাকদন্ডি রাস্তা। মাঝে দু একটা ভিউ পয়েন্ট করা আছে, ছবি তোলার জন্য। পাহাড়ে অনেক হলুদ পাতার মাঝারী মাপের গাছ; ড্রাইভার বলল ওগুলি আখরোট গাছ। গুলমার্গ পৌঁছানোর সাথে সাথেই ঘোড়ার দালাল জুটে গেল। আমরা আগেই জানতাম, রোপওয়ে পর্যন্ত যেতে ঘোড়া না নিলেও চলে। কিন্তু গাড়ী নিলে পাঁচ ছয়টা পয়েন্ট দেখাবে বলে, গাড়ী নিতে রাজী করিয়ে ফেলল। শুরু করল ছয় হাজার টাকা থেকে। শেষে সাড়ে তিন হাজার টাকায় রফা হল। গাড়ী থেকে নেমেই বুঝলাম, এটার জন্য এক হাজার টাকা ভাড়া হওয়া উচিত। টুরিস্ট স্পটে দালালের খপ্পরে পড়ে দরাদরি করতে হবে, এটা ঠিক আছে। কিন্তু এরকম ডাকাতির কবলে পড়তে হবে, কে জানত! ২০.১০.২৪.



বিখ্যাত কার্ঠের শিব মন্দির

#### কাশ্মীর ভ্রমণ 4

গুলমার্গের গন্ডোলা , মানে রোপওয়ে। এর টিকিট এর দারুন চাহিদা। আমরা দু'মাস আগে অনলাইনে টিকিট কেটে নিয়েছিলাম। চাহিদা ওখানে গিয়ে বুকলাম। বিশাল লম্বা লাইন। আমাদের টিকিট এই আঠারই অক্টোবর সকাল এগারোটা পনের থেকে একটা পনের সময়ের। আমরা দশটা কুড়ি নাগাদ গুলমার্গ পৌঁছেছি। সাড়ে তিন হাজার টাকার গাড়ী আমাদের মিনিট চারেকে একটা জায়গায় এনে থামাল। রাস্তার বাম দিকে সুন্দর তৃণভূমি।



ছবি তোলায় মতই। ডান দিকে কুড়ি ধাপ মত সিঁড়ি উঠে ছোট্ট মিলিটারী মিউজিয়াম। একটি হল ঘরে আধুনিক অস্ত্র ইত্যাদির প্রদর্শনী। আর অনেক ছবি। এখানে ছবি তোলা যায়। উল্টো দিকের হলে অনেক ঝকঝকে বসার চেয়ার। সিঙ্গারা আর সন্দেশ বিক্রি করছেন। আমি একটা সিঙ্গারা খেলাম। এরপর গন্ডোলা পর্যন্ত যেতে এক কিমি মত রাস্তা। পাশে পাশে গোটা চার পাঁচ জায়গায় নেমে দেখতে বলল। ব্রিটিশ আমলের গল্ফ গ্রাউন্ড, এই সব।



আমরা কোথাও না নেমে সোজা গিয়ে লাইনে দাঁড়ালাম। হলের বাইরে প্রায় চার পাঁচ শ লোকের পিছনে দাঁড়ালাম। কিছু লোক লাইন ভেঙ্গে এগোনোর চেষ্টা করছে দেখে সি আর পি জওয়ান দারুন ধমক দিল। হলের ভেতরে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে প্রায় এক ঘন্টা লাইন চলল। এরপর টিকিটের কিউ আর স্ক্যান, আধার কার্ড মিলিয়ে ছাড়া হল। এক একটা গন্ডোলায় ছয় জনের বসার ব্যবস্থা। হিসেব করে করে বসানো। যেমন আমরা তিনজন, সাথে আর তিনজন ডেকে বসাতে হচ্ছে।



মিনিট দশ বারো চলার পর প্রথম ধাপ। ওখানে নেমে অনেকটা বিস্তীর্ণ প্রান্তর মত আছে। এখন বরফ নেই। কিছু ছবি তুলে, দ্বিতীয় ধাপের জন্য লাইন দিলাম। আবার মিনিট দশেক উঠে গেলাম। ওখানে ধুধু প্রান্তর। পাথরের খাঁজে খাঁজে কিছু বরফ পেলাম। এই জায়গা প্রায়ই বরফে ঢেকে থাকে। আমরা আপেল দেখার জন্য এসেছি, এ সময় বরফ থাকে না। আবার সেই ফেরার লাইন। এক এক ধাপে এক ঘন্টা লাইন। প্রথম ধাপে নেমে, মাঠের অন্য প্রান্তে গিয়ে খেয়ে নিলাম। পরে অবশ্য বুঝেছি ঐ খাদ্য খুব স্বাস্থ্যকর ছিল না; আমাদের সবার পেট খারাপ হল।

ফেরার পথে আমাদের ভ্রমণের মূল আকর্ষণ; আপেল বাগানে গাছে পাকা আপেল দেখা, হল। কুড়ি টাকা করে দিয়ে বাগানে ঢোকা হল।



আমাদের আগে একটা বড় দল চুকেছে। বাগানে চুকে তো আমাদের আনন্দে আত্মহারা অবস্থা। এতোদিন ছবিতে দেখেছি, এবার নিজের চোখে দেখলাম। সবাই ছবি তোলার জন্য ব্যস্ত। এটা ছোট একটি বাগান, সব গাছ ভরে আছে পাকা আপেল। খুব কড়া পাহারা। আগের দলের লোকদের প্রায় ঠেলে বের করছিল। বাগানের মধ্যে পেটি পেটি আপেল বিক্রী হচ্ছে। সাথে সাথে তৈরী করা আপেলের রস খেলাম। চল্লিশটি আপেলের একটি ছোট প্যাকেট চারশ টাকায় কেনা হল। আঠারো কেজির বড় পেটি, তাও দু একটা বিক্রী হল। পরে রস বিক্রেতার কাছ থেকে

জানলাম, এই বাগানের আপেল পাড়া হয় না, এগুলি শুধু ছবি তোলার জন্য রাখা। পরে আমরা অন্য বাগানে, একেবারেই গাছ থেকে পাড়া আপেল খেলাম। হোটেলে ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। আপেলের পেটি গাড়িতেই থাকল। এই গাড়ী আমাদের কাটরা স্টেশনে পৌঁছে দেবে। ২১.১০.২৪.



on 18.10.2024.

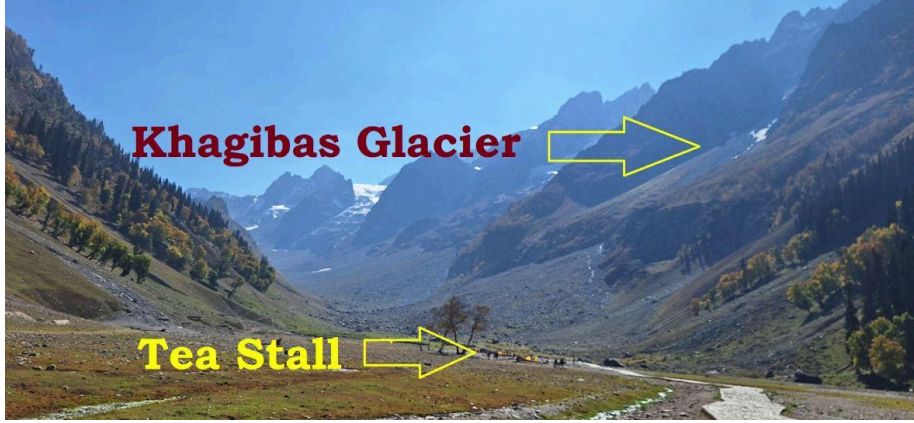
## কাশ্মীর ভ্রমণ 5

19 অক্টোবর আমাদের সোনমার্গ যাওয়ার কথা। শ্রীনগর থেকে প্রায় নব্বই কিমি দূর, তাই সকালে আটটাতেই রওয়ানা হলাম। আমাদের এই ড্রাইভার খুব সময় মেনে চলে। শহরের বাইরে বেরনোর জন্য একটি সরু শহরতলীর রাস্তা ধরে অনেকটা চললাম। একটা জায়গায় রাস্তার পাশে পরপর বেশ কয়েকটি প্রাচীন চিনার গাছ আছে। প্রায় গোটা রাস্তার পাশে, এমনকি রাস্তার মাঝেও বিশাল বিশাল চিনার গাছ। কেউ কোনোদিন একটা ডালও কেটেছে বলে মনে হয় না। শহর থেকে দশ বারো কিমি বাইরে, শিন্ড নদীর উপর ব্রীজ পেরিয়ে অন্য পাড়ে গেলাম। গোটা রাষ্ট্রই এই নদীর পাড়ে পাড়ে চললাম। এটা কিন্তু ইন্ডাস বা সিন্ধু নদী নয়।



The Sind River , সিন্ধু নয়

এগারোটা নাগাদ সোনমার্গে গাড়ী পৌঁছল। গাড়ী থামার সাথে সাথেই ঘোড়ার দালাল এসে গেল। তিনটি ঘোড়ার জন্য বারো হাজার টাকা বলল। আমরা তিন বারো ছত্রিশ থেকে দরাদরি শুরু করে সাড়ে চার হাজার টাকায় রফা হল। আমরা কেউ কোনোদিন ঘোড়ায় চাপিনি। এগুলি সবই একটু নিচু। আসলে এরা সব খচ্চর। বাংলায় কেন যে এদের নিয়ে একটা গালাগালি চালু হয়েছে জানিনা। এরা কিন্তু বেশ বাধ্য হয়ে থাকে দেখলাম। আমাদের তিনজনের জন্য একজন সহিস। উনিশ বছরের ছেলে। ওই আমাদের গাইড। মুখে নানান শব্দ করে, শিশ দিয়ে ঘোড়াদের নির্দেশ দেয়। আমার স্ত্রী ওকে জিপ্তেস করল, তুমি একা তিনটি ঘোড়া কি করে সামলাবে? ও বলল, আমি দশটা ঘোড়া সামলাতে পারি। পঞ্চাশ মিটার মত বাঁধানো ফুটপাথ ধরে চলার পর, ডানদিকের রাস্তা ধরল ঘোড়ার মিছিল। সামান্য সময় পরই এবারো খেবড়ো পাথরের ভেতর দিয়ে চলল। নীচের দিকে তাকালে মনে হবে , এই বুঝি ঘোড়া হোঁচট খেয়ে পড়ল। কিন্তু ওরা যে ওতেই চলতে অভ্যস্ত, একটা ঘোড়াও একবারও হোঁচট খেল না। সহিস ছেলেটি পাশে পাশে ধারা বিবরণী দিতে দিতে চলল। ডান দিকে একটু নিচে একটা মাঠ মত দেখিয়ে বলল, ওখানে অমিতাভ বচ্চনের সিনেমার শ্যুটিং হয়েছিল; সিনেমার নামও বলল। আমার মত বেরসিকের কাছে সবই সমান, নামটা একটু পরেই ভুলে গেলাম। আরও একটা জায়গায় ঐ রকম সিনেমার শ্যুটিং এর খবর বলেছিল। এক কিমি মত চলে, আমরা ওপর থেকে দেখলাম নিচে একটা জায়গায় বেশ কয়েকটি ঘোড়া জড়ো হয়েছে। ছেলেটি বলল, ওটি এক নম্বর পয়েন্ট। আমরা আরও এগিয়ে যাব, তাই ওখানে নামব না। দু দিকেই বিশাল বিশাল উঁচু পাহাড়, মাঝে পাথর ছড়ানো নদীর পথ। সামান্য একটা জলের ধারা দেখা যায়। একটা জায়গায় উল্টো দিকের পাহাড়ে একটি হিমবাহ দেখিয়ে বলল, ওটি খাজিবাস হিমবাহ।



নদীর থেকে অন্তত হাজার ফুট উপরে সাদা বরফ নেমে এসেছে। আমরা এদিকের পাহাড়ের গা বেয়ে এগিয়ে চললাম। চারিদিকের দৃশ্য অতি সুন্দর। বেশ কিছুক্ষণ চলার পর ঘোড়া নীচের দিকে নেমে একেবারে নদীর কাছে চলে এল। সহিশ ছেলেটি আমাদের দেখিয়ে দিল, কেমন করে লাগাম আলগা করে ঘোড়াকে জল খেতে দিতে হবে। পাথরের উপর দিয়ে কয়েক ইঞ্চি গভীর জল বয়ে যাচ্ছে। সব ঘোড়া ওখানে মুখ দিয়ে জল খেয়ে তারপর এগোল। নদীর পাশে অনেকটা মাঠের মত; তার মধ্যে একজন চা বিক্রী করতে বসেছে। আমরা ঘোড়া থেকে নেমে চা খেলাম। অনেকেই ওখানে চা খেয়ে ফেরার রাস্তা ধরল। আমাদের ঘোড়া চলল এগিয়ে। আবার একটু একটু করে পাহাড়ের গা বেয়ে উঠে যেতে থাকল। সামনে আর ঘোড়া দেখতেও পাচ্ছিলাম না। একটু দূরে উঁচু পাহাড়ের খাঁজে আর একটা হিমবাহ দেখতে পাচ্ছিলাম। ঐ উপরে ওঠার কথা ভাবতেই পারছিলাম না। ক্রমশ উঠতে উঠতে নদীর জলের ধারা থেকে প্রায় হাজার ফুট উপরে উঠে গেলাম। একটি জায়গায় প্রায় পঁচিশ তিরিশ ফুট রাস্তা এক ফুট বা তারও কম চওড়া। ঘোড়া নিজের ছন্দে চলল। সেরকম লোক হলে নীচে নদীর দিকে তাকিয়ে ভয়েই শেষ হয়ে যেতে পারে। ঐ পথে ফেরার সময় উল্টো দিক থেকে গোটা চারেক ঘোড়া এসে গেল। দুজন মানুষ পের হওয়াই অসম্ভব। এদিকে একটা জায়গায় চারটি ঘোড়াকে থামিয়ে ওদের সহীশ ধরে দাঁড়িয়ে থাকল, আমরা পেরনোর পর ওরা গেল। আমাদের সহীস ছেলেটি বলল, আমি শিশ দিয়ে ওদের জানিয়ে থামতে বলেছি। পরের কথা আগে বলে দিলাম। ঐ ভয়ংকর মোড়টা পেরনোর পর সামনে গোটা দুই ঘোড়া দেখলাম। এক সাদা চামড়ার ছিপছিপে যুবক হাতে একটা হেলমেট ঝুলিয়ে হেঁটে ফিরছে দেখলাম। ঐ বিকট পাথুরে রাস্তায় কি করে হাটছে, ভাবাই যায় না। এক পাথর ছড়ানো জায়গায় পৌঁছনোর আগে, একটু বাম পাশে একটা খাদের উপরে একটা পাথরের সেতুর মত হয়ে আছে দেখলাম। ওটার কুড়ি পঁচিশ ফুট দূরে, ঘোড়া থেকে নামতে বলল। তারপর সামনের কাঠ কয়লায় ঢাকা একটা বিরাট চাখাল দেখিয়ে বলল, ঐ দেখুন গ্লেসিয়ার।



প্রথমে তো বুঝতেই পারিনি কোথায় দেখতে বলছে। পরে সেই ন্যাচারাল ব্রীজ এর অন্য প্রান্ত দেখে বুঝলাম, ওটা হিমবাহ গলে, একটা বিরাট খোদল মত হয়েছে। ওদিকে হলদেটে সাদা মার্বেল পাথরের মত ওটি আসল জমাট বাঁধা হিমবাহ। ওটিই সিন্ধু নদীর উৎস। সোন মার্গে এসে যে একেবারে একটা নদীর উৎস পর্যন্ত যাওয়া যায়, আগে কেউ বলেনি। আমি ইউটিউব ভিডিও দেখেছি, খাজীবাস হিমবাহ সাদা বরফ নিয়ে নদীর কাছে নেমে এসেছে। সেই সময় আরও দেড় কিমি এগিয়ে যাওয়ার প্রস্নই ওঠে না। ফেরার জন্য ঘোড়ায় উঠতেই ঘোড়াগুলি যেন দ্বিগুণ উৎসাহে চলতে শুরু করল। এবার আর নদীর কাছে নামাই হল না। উপরের পথ ধরেই চললাম। ঘোড়া মাঝে মাঝে পড়ে থাকা শুকনো পাতা খেতে থাকল। এ বেচারাদের কোন সময়ই বোধহয় পেট ভরে খাওয়া জোটে না। যেতে দু ঘন্টা, ফিরতে এক ঘন্টা লাগল। ফিরে ঘোড়া থেকে নামতেই ঘোড়ার আসল মালিক এসে গেল টাকা নিতে। সোহিস বলল, আমাকে বখশিস দিন। একশ টাকা দিলাম। মালিক লোকটিকে UPI Payment করতে গিয়ে পড়লাম বিপদে। এমন বিপদে এই প্রথম পড়লাম। সে এক ভিড়কুটি কান্ড। চলল প্রায় তিন দিনের বেশী। ২২.১০.২৪.



শীতের সোনমার্গ

কাশ্মীর 6 ( UPI ব্যবহার এর বিড়ম্বনা)

আমি অনেকদিনই SBI BHIM UPI ব্যবহার করি। ভীম মাঝে মাঝেই কাজ করে না। আসলে এর নিরাপত্তা ব্যবস্থা এত বেশি যে, এতটুকু সন্দেহ হলেই, পেমেন্ট বন্ধ করে দেয়। আমার এই সমস্যা হচ্ছে দেখে, আমার মেয়ে বলল, বাইরে যাচ্ছ, ফোন পে লাগিয়ে দিচ্ছি। বাড়ীতে বসে দু চারটি লেনদেন করে , পরীক্ষা করে নিলাম। কাশ্মীরে গিয়েও ঠিকই কাজ করছিল। সোনমার্গে ঘোড়ার আসল মালিককে সাড়ে চার হাজার টাকা দিতে গিয়ে, ঝুলে গেল। Processing চলল তিনদিন ধরে। ঘোড়াওলা বলল, এই সমস্যা হয় মাঝে মাঝে, দু দিনও লাগে। ওকে বললাম, ঐ আমাদের গাড়ী, ওখানে গিয়ে বসি। দেখি হয় কি না। ওর তাতে আপত্তি নেই। গাড়ীর ড্রাইভার মাঝে মাঝেই লোক নিয়ে আসে। রাস্তায় হোটেল, আপেল বাগান এসব জায়গায় ওকে চেনে দেখেছি। ওকে বললাম সমস্যাটা। ও জানাল , ঘোড়াওলার সাথে আলাপ নেই। আরও কিছুক্ষণ দেখার জন্য, ট্যাক্সি স্ট্যান্ড এর পাশের একটা সুন্দর হোটেলে ঢুকে বসলাম, দুপুরের খাবারের জন্য। আমাদের সবারই পেট বিগড়ে আছে। তাই খাবার প্রায় কিছুই পেলাম না। খিচুড়ি খেতে গিয়ে দেখি, লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে, ভয়ংকর ঝাল করে দিয়েছে। তাই কয়েক চামচ খেয়ে তো রাত্রে আমাকে বার চারেক উঠতে হল। আমাদের বেড়ানোর এইটা সবথেকে বড় সমস্যা; বাইরের কোন খাওয়ার সহ্য হয় না। হোটেলের খাওয়ার টেবিলে বসে , আমার মেয়ে ফোনে নানান ভাবে চেষ্টা করে চলল, যদি ঐ UPI Payment টা বন্ধ করা যায়; হল না। আমার Bank of Baroda থেকে যদি payment Stop করা যায়, ওদের দুটি ল্যান্ড লাইনে ফোন করলাম। ফোন বেজেই গেল, কেউ ধরল না। Phone pay Customer care এ কয়েকবারের চেষ্টায় কানেকশন হল। কিন্তু OTP তো আসবে কলকাতার মোবাইলে; সে তো ওখানে কাজ করে না। সব চেষ্টা ছেড়ে , শেষ পর্যন্ত ঘোড়াওলাকে ক্যাশ টাকা দিয়ে চলে এলাম। লোকটি ভদ্রলোক। টাকা ওর একাউন্ট এ ঢুকলে, ফেরৎ করে দেবে, এই আশা করে চলে আসা ছাড়া করার কিছুই ছিল না। অ্যাপ দেখাচ্ছিল, Processing, ৪৮ ঘন্টাও লাগতে পারে। পরের দুদিন একই জিনিস দেখিয়ে গেল। তিন দিন পর যখন প্রায় কাটার কাছ ফিরে এসেছি, গাড়ীতে বসে অ্যাপ খুলে দেখি, পেমেন্ট হয়ে গেছে। মেয়ে সাথে সাথেই ঘোড়ার মালিককে ফোন করে জানাল। আমার ফোনের থেকে পেমেন্ট স্ট্যাটাস ওর Whats app এ পাঠাতেই , আমার UPI তে টাকা ফেরৎ পাঠিয়ে দিল। আজকাল UPI, কার্ড পেমেন্ট এসবের জন্য আমি তো ATM Card ও নিয়ে যাই না। ক্যাশ টাকা কিছু থাকে সাথে।

পরদিন সকালে আমরা শ্রীনগরের হোটেল ছেড়ে পাহেলগাও রওনা দেব। এই সব শীতের জায়গায় হোটেলের ছেলেগুলো আটটার আগে ঘুম থেকে উঠতে চায় না। আগের রাতে বলে, বিল তৈরী করে নিতে হয়। আমরা ভোরে উঠে, গরম জলে স্নান করে, আটটায় হোটেল ছেড়ে দিয়ে গাড়ীতে ওঠার জন্য তৈরী। মেয়ে বিল মেটাতে গিয়ে ফিরে এসে বলল, ATM এ যেতে হবে, এরা ক্যাশ টাকা দিতে বলছে। এত ভাল হোটেল, UPI payment নেবে না, ভাবি নি। হোটেলেরই একটি ছেলে আমাদের নিয়ে চলল ATM দেখাতে। এর মধ্যে আমাদের চার দিন থাকা হয়ে গেছে শ্রীনগরে। শহরে রাস্তার মোড়ে মোড়ে, আধুনিক অস্ত্র হাতে CRPF দেখে দেখে, ওটাই স্বাভাবিক বুঝে গেছি। এমন কি হাইওয়ের পাশে চাষের মাঠেও ওদের ডিউটি করতে দেখে দেখে, ওটাই স্বাভাবিক বুঝে গেছি। কিন্তু আজ সকালে হোটেল থেকে বেরিয়ে গলির মুখে আসতেই ওদের সংখ্যা অস্বাভাবিক বেশী দেখলাম।

বড় রাস্তা সকালে ফাঁকা ফাঁকা থেকেই; আজ লালচক সবদিক দিয়ে বন্ধ। গাড়ী ঢোকা তো বন্ধই, আমাদের হেঁটেও যেতে দিল না। ঘুরে গেলাম ATM এ। প্রথম ATM এ মেয়ে ঢুকে যতক্ষণে বেরল, বাইরে থাকা CRPF জওয়ান এর সাথে গল্প করলাম। একজন বাঙালি জওয়ান ছিলেন, তার সাথেই কথা হল। মেয়ে বেরিয়ে বলল, এখানে টাকা নেই। জওয়ানই দেখিয়ে দিলেন, উল্টো দিকে J & K ব্যাংক এর ব্রাঞ্চ অফিস। সেটার ভেতরেই ATM, কাজ হল। ফেরার সময়ও ঘুরে আসতে হল। লালচকে মাছি গলতে পারছে না। হোটেলের ছেলেটা দেখলাম নির্বিকার। সে বলল, আজ রবিবার, এই বড় রাস্তার পাশের ফুটপাথে বাজার বসবে, দশটার পর মেলার মত ভিড় হবে। ঐ রবিবারের হাটের জন্য এত কড়াকড়ি কি না বুঝলাম না। পরে খবরে দেখেছি, আগের দিন দূরে কোথাও জঙ্গি হানা হয়েছে। আমরা স্বাভাবিক ভাবেই পহেলগাও রওনা দিলাম। ঐ শ্রীনগরে ছাড়া আর কোথাও কড়াকড়ি দেখিনি এই কদিনে। প্যাহেলগাও এর গাড়ীর ড্রাইভার ছেলেটিও খুবই ভালো পেয়েছিলাম। সে নিজের থেকেই বলল, টিভিতে টেররিস্ট এ্যাটাক ইত্যাদি দেখিয়ে টুরিস্টদের ভয় পাইয়ে দেয়। টুরিস্টই তো আমাদের সব; টুরিজম নিয়েই তো আমরা বেঁচে আছি। ঘোড়ার দালাল, বা গাড়ীর দালাল ছাড়া সবার ব্যবহারই বেশ আন্তরিক। আমার ঐ ঘোড়ার মালিক আমাকে টাকা না পাঠালে আমি কিই বা করতে পারতাম! পাহেলগাঁও ভ্রমণই কাশ্মীর ভ্রমণ এর আসল মজা। শেষ দুদিন ওখানে ছিলাম। ওখান থেকে ফেরার রাস্তাও আমাদের জন্য অনেক সুন্দর অভিজ্ঞতা নিয়ে অপেক্ষা করছিল। ২৩.১০.২৪.



গুলমার্গের মিউজিয়ামে

কাশ্মীরে ৭

কুড়ি তারিখ, রবিবার সকালে আমরা চললাম পাহেলগাম। আমি আগেই বলেছি, আমার এবার কাশ্মীর ভ্রমণ এর দিন ঠিক করেছি, বাগানে পাকা আপেল দেখার জন্য। আসার সময়ই গাড়ীর ড্রাইভার রিঙ্কু শর্মা কে বলেছিলাম, আপেল বাগানে দাঁড়াতে। সে বলেছিল, কত দেখবে? চল, দেখা বো। গুলমার্গ থেকে ফেরার পথে একটা ছোট একটা বাগানে ঢুকে, হা হয়ে গেছিলাম। আপেল ওখানে কিনেছি দেখে রিঙ্কু বলেছিল, এত আগেই না কিনে পাহেলগাম এর রাস্তায় কিনতে পারতে। ঠিকই বলেছিল। কাটরা থেকে শ্রীনগর আসার সময়ই দেখেছি, অনন্তনাগ এর রাস্তা ডানদিকে চলে গেছে। এই রাস্তায় যেতে হবে পাহেলগাম। শ্রীনগর এর দিকে কিছুটা এগোনোর পর, দুই রকমের জিনিস চোখে পড়বেই। কয়েক মাইল ধরে হাইওয়ের পাশে পাশে চলল, ক্রিকেট ব্যাট তৈরীর কারখানা। প্রায় সব বাড়ীতেই। ছাদে সাজানো হয়েছে কাঠের টুকরো। নিচে, রাস্তার দিকে ব্যাটের দোকান। তার কয়েক মাইল পর শুরু হয়েছে কেশর এর দোকান। মনে হচ্ছিল, শক্তিগড় এর ল্যাংচার দোকান এর মত। কিন্তু পরে গুণতে গিয়ে দেখি কয়েক হাজার হতে পারে। মনে হবে, অভিধানে যত শব্দ আছে, সব দিয়ে দোকানের নাম আছে। রিঙ্কু বলেছিল, কিনতে চাইলে নামতে পার। আমাদের আগ্রহ ছিল না। ফাঁকা মাঠ দেখিয়ে রিঙ্কু বলেছিল, এইগুলিতে কেশর চাষ করা হয়। এবার পাহেলগামের দিকে যাওয়ার সময় ব্যাট তৈরীর কারখানা দেখার জন্য থামতে চাইলেও, ড্রাইভার থামল না। অনন্তনাগ জেলা শহরের ভেতর দিয়ে এগিয়ে গেলাম। আবার দু দিকে ফাঁকা মাঠ। একটি আপেল বাগানের সামনে গাড়ী থেকে নামলাম। বাগানের মালিক বা মালিকের ছেলে রাজু এগিয়ে এসে অভ্যর্থনা জানাল। বাগানে ঢুকে প্রথমে চোখে পড়ল, রাজুর মত আর একজন, কয়েকজনকে চেয়ারে বসিয়ে নানান জিনিস বিক্রী করতে ব্যস্ত। বোতলে ভরা আপেলের জ্যাম, ইত্যাদি বিক্রিতে ওদের বেশ আগ্রহ। আমি সোজা বাগানের মধ্যে ঢুকে ছবি তোলা শুরু করলাম। ভেতরের দিকে গাছে প্রচুর আপেল।



রাজুর বাগানে

রাজু নিজেই আপেলের রস বানিয়ে খাওয়াল। ছবি তুলে খুশী কি না জানতে চাইলে বললাম, গাছের থেকে আপেল পেড়ে খেতে চাই। সাথে সাথেই রাজী। আমাকে নিয়ে ভেতরের দিকে এগিয়ে গেল। একটা গাছের থেকে টুকটুকে লাল আপেল পেড়ে দিল। আগেই দেখেছি, রিঙ্কু একটা বড় আপেল খাচ্ছে। আমার স্ত্রী কন্যা কিছু জ্যাম জেলি

ইত্যাদি কিনল। আরও ঘন্টা দেড়েক পর পৌঁছলাম পাহেলগম। বাজারের পাশেই আমাদের হোটেল। একটা নাগাদ হোটেল এ পৌঁছেছি। ওদের কাছে জানতে চাইলাম, তিনটা নাগাদ বেরিয়ে বৈসারণ যাব কি না। ওরা বলল, দুটোর আগে বেরিয়ে যাও। আমরা দুপুরে খেয়েই বেরোলাম। রিস্কুর গাড়ী এখানে দুদিন বসেই থাকবে; ও ওর বন্ধুর বাড়ী চলে গেল। আমরা হোটেল থেকে বেরিয়ে দু পা হাঁটতে না হাঁটতে ঘোড়ার জন্য এক বয়স্ক শহিস আমাদের ধরে, মালিকের কাছে নিয়ে গেল। মাঠে কয়েকশ ঘোড়া আছে। আবার দরাদরি শুরু হল। তিনটি ঘোড়া নয় না দশ হাজার টাকা থেকে শুরু করে, পাঁচ হাজার টাকায় রফা হল। হোটেলের প্রায় পিছনের দিকে পাহাড়ের গা বেয়ে রাস্তা। এবার তিনটি ঘোড়ার জন্য দুজন গাইড। একশ মিটার মত চলার পর শুরু হল বিভৎস পাথুরে রাস্তায় চড়াই। যেমন বাজে রাস্তা তেমনই খারাই। বড় বড় পাইন গাছের ছায়ায় ছায়ায় চলল ঘোড়া। নিচের দিকে পাথরের মাঝে মাঝে কাদা। তারপর শুরু হল ধুলো। ঘোড়ার পায়খানার ধুলো। ফেরার সময় মাস্ক ব্যবহার করতে হল। ঐ খাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে চলতে চলতে দু জায়গায় থেমে, কম বয়সের ছেলেটি বলল, এটা একটা পয়েন্ট। বিশেষ কিছু নেই। উঠতে উঠতে এক সময় দেখি কয়েকশ ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে। ওটাই বৈসারণ এর গেট। পঁয়ত্রিশ টাকার টিকিট কেটে ভেতরে ঢুকে দেখি, একটা বিশাল বিস্তীর্ণ সবুজ উপত্যকা। পাহাড়ের মাথায় এরকম একটা মাঠ হতে পারে, না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। কয়েকশ যাত্রী, কিন্তু একটুও ভিড় মনে হয় না। যে যার মত ঘুরছে, ছবি তুলছে।



বৈসারণ

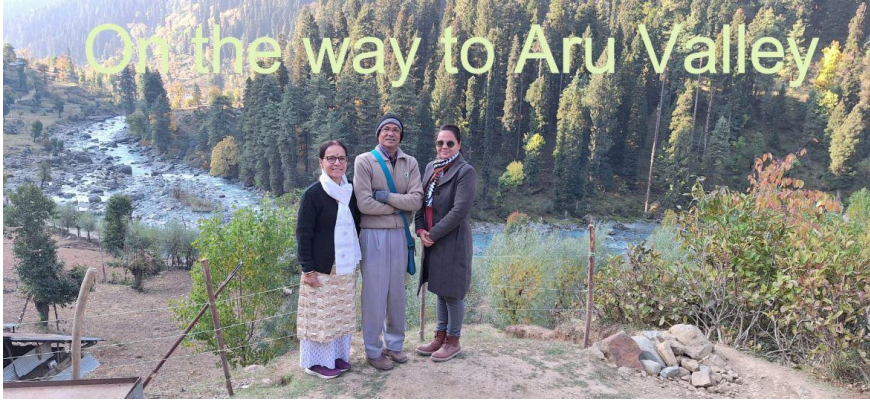
চারদিকের পাহাড় এর মাথায় এই সময় বরফ নেই। থাকলে এর মিনি সুইজারল্যান্ড নাম সার্থক। এখানেই একটি ছেলে একটি পশমিনা ছাগল নিয়ে এসে ছবি তোলার জন্য দরবার করলে, আমরা



দুটি ছবি তোলার জন্য ওকে কুড়ি টাকা দিলাম। অন্য জায়গায়, পরে আরও অনেক এরকম সাদা লোমশ ছাগল দেখেছি। এক ঘন্টা মত থেকে বেরিয়ে এলাম। খাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে নামার সময় কিন্তু ভয় পাইয়ে দিতে থাকে। ঘোড়াগুলি যে এই রাস্তায় চলতে পটু, বোঝাই যায়। ফিরতে ফিরতে বিকেল হয়ে গেল। পরদিন লোকাল গাড়ী নিয়ে অন্য দিকে যেতে হবে। আজ সন্ধ্যা টিভি দেখেই কাটালাম। ২৪.১০.২৪. ফেরার পথে, রাজধানী এক্সপ্রেস তিন ঘন্টা দেরী করে চলছে, বসে বসে লিখছি।

কাশ্মীরে ৮

পাহেলগামে একরাত থাকলে পরের দিন সকালে তিন চার ঘন্টার জন্য গাড়ী নিয়ে, তিনটি জায়গা ঘুরে, দুপুরের মধ্যেই ফিরে আসা যায়। সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি সামনের রাস্তায় চায়ের দোকান বসেছে। হোটেলের ছেলে শুয়েই থাকল। আমি নিজেই চাবি নিয়ে দরজা খুলে বাইরে বেরোলাম। বাইরে বেশ ঠাণ্ডা। চায়ের দোকানেই গাড়ীর লোকের সাথে দেখা হল। ছোট গাড়ী বাইশ শ টাকা বলল। আরও বলল, এখনই বেরোলে টোল এর টাকা লাগবে না। এত সকালে সবাই তৈরী হতে পারবে না, আধ ঘন্টা পর বেরোব জানালাম। সাড়ে আটটায় বেড়িয়ে চললাম আরু ভ্যালী। বারো কিমি রাস্তার পাশের প্রায় পুরোটাই পাশে পাশে লিদার নদী, উল্টো দিকের পাহাড়ে সুন্দর পাইন গাছের দৃশ্য। সব জায়গায়ই ছবি তোলা হইছে। দু তিন জায়গায় নেমে ছবি তোলা হল।



টোলের গুমটিতে অত সকালে লোক আসেনি। আরু ভ্যালীতে নেমেই বুকলাম প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। আমি তো এমনিতেই শীতকাতুরে, টুপী গ্লাভস নিয়েই বেরোই। আমার স্ত্রী, মাফলার হোটলে রেখে চলে গেছিল; নেমে কাঁপতে থাকল। আরু ভ্যালী অনেকটা ছোট। বৈশরন এর দশ ভাগের এক ভাগও হবে না। পাহাড়গুলি মনে হয় হাতের কাছেই।



আরু ভ্যালি

একটি ভালো হোটেল আছে, মাঠের পাশে। একজন বয়স্ক মানুষ , কাশ্মীরি জোব্বা গায়ে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ডাকছিল; চা কফি খেতে। কাছে গিয়ে জানতে চাইলাম, আপনার দোকান কোথায়? বললেন, দোকান নয়, হোটলেই পাবেন। ঢুকলাম, মূলত ঠাণ্ডা থেকে বাঁচতে। বিরাট ডাইনিং রুমে বসলাম। ওনার জোব্বার ভেতর থেকে কাঙ্গরি বের করে দিয়ে বললেন, হাত সঁকে নাও।



এই কাঙরির কথা আমি পঁয়তাল্লিশ বছর আগে, সার্জারী বইতে পড়েছি। এই প্রথম দেখলাম। বেশ আরাম করে হাত গরম করে নিলাম। বেতের বোনা ফুলের সাজির মত। মাঝে মাটির পাত্রে কাঠ কয়লার আগুন। পরে দেখেছি, রাস্তায় ছোট দোকানে বিক্রী হচ্ছে। কফি খেয়ে বেরিয়ে দেখি একটি ছেলে, শাল, মাফলার ইত্যাদির দোকান বসাচ্ছে, মাঠে। ওর কাছে, স্ত্রীর জন্য একটি সস্তা মাফলার কেনা হল। এরপর চললাম, বেতাব ভ্যালি। গাড়ীতে উঠে ড্রাইভার ছেলেটির সাথে নতুন করে দাম দর কষাকষি করেছি। ওদের হিসেবে, সকালের চার ঘন্টার জন্য বাইশ' শ পঞ্চাশ টাকা। তিনটি জায়গায় এক ঘন্টা করে থাকা যাবে। তার বেশী হলে, ঘন্টায় সাড়ে চার শ টাকা করে। আর সাড়ে তিন হাজার টাকায় রফা হল, বিকেল পর্যন্ত থাকা যাবে। দু তিনটি অন্য জায়গায়ও নিয়ে যাবে। আর থেকে আধ ঘন্টা মত লাগল বেতাব ভ্যালী যেতে। গাড়িতেই ড্রাইভার বলেছিল, ঘোড়ায় চড়ার জন্য চারশ টাকার বেশি রাজী হবেন না। নামার সাথে সাথেই ঘোড়ার দালাল জুটে গেল। তিনটি ঘোড়ার জন্য চার হাজার টাকা থেকে শুরু করে তিন হাজার টাকা পর্যন্ত নামাল। আমরা তো ঘোড়ায় আর চড়বই না। একশ টাকা করে টিকিট কেটে ভেতরে ঢুকলাম। প্রথম দিকে প্রায় সাত - আট শ' মিটার এক রকম গাছের ছায়ায় ছায়ায় চললাম। পরে ঘোড়াওলা বলল, ওগুলি “বীলু” গাছ। ঐ গাছের কাঠে ক্রিকেট ব্যাট হয় বলতে বুঝলাম, ওগুলি উইলো গাছ। উইলো বাগান ছাড়িয়ে পৌঁছে গেলাম সুন্দর একটি সবুজ প্রান্তরে। চারিদিকে পাহাড়। আমরা সোনালী রোদে বসে সময় কাটালাম, ছবি তোলা হল।



বেতাব ভ্যালি

এখানেও একজন, সাদা লম্বা লোমের পশমিনা ছাগল নিয়ে হাজির। এ ছাড়াও খরগোশ, সাদা পায়রা নিয়েও কম বয়সের ছেলে মেয়ে এসে বলছে, ছবি তোলার জন্য দশ কুড়ি টাকা দাও। বোঝা যায়, এদের পড়াশোনার কথা কেউ ভাবেনি, কম বয়সের থেকেই কিছু রোজগার করা শুরু করে দিয়েছে। এই দিনের ড্রাইভার আমাদের সেরকমই কিছু খবর বলেছিল। গ্রামে ওর নিজের মেয়েরা এখন স্কুলে পড়ছে। কলেজ সেই জেলা শহর অনন্তনাগে। আমাদেরকে বসে থাকতে দেখে প্রথমে এক ঘোড়াওলা এসে বলল, তিনশ টাকা দিয়ে চলুন। এদের জন্য মায়া হচ্ছিল। কিন্তু আমার স্ত্রী কন্যা আর ঘোড়ায় চড়তে রাজী নয়। আবার একজন এসে বলল, দুই শ

টাকা দেবেন, চলুন। বুঝলাম, সকাল থেকে বেচারার কোন রোজগার করা হয়নি। ওর জন্য বড় মায়া হল ; চললাম ওর সাথে। ঘাসের উপর বোধহয় ঘোড়া চালানোর অনুমতি নেই। নদীর তীরে, বালুচরে গোটা পঞ্চাশ ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে নিয়ে একটা কালো ঘোড়ায় তুলল। ঘোড়া সোজা নদীর জলে নেমে চলল। স্বচ্ছ জলের নীচে নুড়ি পাথর। জল ছয় আট ইঞ্চি হবে। ঘোড়ার পায়ের থেকে একটু জল ছিটিয়ে আমার পায়ের লাগছিল। জল পেরিয়ে নীচু ডাঙায় উঠে কালো ঘোড়া দাঁড়িয়ে থাকতে চাইল, একবার মনে হল, ফিরে যেতে চায়। কি ব্যাপার, জানতে চাইলে শহিষ বলল, ওর সঙ্গী আসেনি বলে ফিরে দেখছে। ওকে তাড়া দিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলল। পনের মিনিট পর ফেরার সময়, ঘোড়াওয়ালার সাথে কথা বলতে বলতে আসছিলাম। ওর দুটি ঘোড়া। এই কালো আর একটা সাদা। বছর দশ বারো আগে বেশ দাম দিয়েই কিনেছে। আর ভ্যালির লোকেরা বরফের সময়, নিচের দিকে নেমে আসে বলেছিল। এই ঘোড়াওয়ালা বলল, আমরা গ্রামেই বসে থাকি, জঙ্গলের থেকে কাঠ জোগাড় করে রাখি, তাতেই ঘর গরম করে নিতে হয়। গোটা মাঠ তো বরফে ঢাকা থাকে, ঘোড়া খায় কি? ও বলল, মকাই আর কি সব খেতে দিতে হয়। আমরা জল পেরনোর সময় দেখলাম, সাদা ঘোড়াটা আমাদের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমরা ওর কাছে ফিরলে, যেন নিশ্চিত হয়ে পাশ ফিরল। নদীর দুটি ধারা পেরিয়ে, একটা পাথর ছড়ানো মাঠ মত; ওরা বলে, কোনি মার্গ। তারপর নদী বেশ বড় বড় পাথরের ভেতর দিয়ে ফুট পাঁচ সাত নিচে নেমে এসেছে। এটাকেই ওরা বলে, ওয়াটার ফলস। কিছুই দেখার নেই। কিন্তু আমাদের মত পর্যটকেরা না চাপলে ওদের রোজগার শূন্য। আর বাইরের দালালের খপ্পরে পড়ে হাজার টাকা দিলে, আটশ টাকাই জলে। ঘোড়া আর তার মালিকের কথা ভাবতে ভাবতে ফিরে এলাম গাড়ীর কাছে। এরপরের গন্তব্য , চন্দনওয়ারী। এই চন্দনোয়ারি থেকেই অমরনাথ যাত্রার জন্য পদযাত্রা শুরু হয়। এখন তো হুশ করে গাড়ী চলে গেল, প্রায় দশ বারো কিমি। যাত্রার সময় লাখ লাখ মানুষ হাজীর হয়, হাঁটাচলার জায়গাই থাকে না। চন্দনোয়ারি বেশ দোকান পাট নিয়ে জমজমাট জায়গা। গাড়ী , পার্কিং এর দিকে গেল, আমরা সোজা হাঁটতে শুরু করে কিছুটা বাম দিকে এগোলাম। এখানে শত শত পর্যটক। সবাই একবার অমরনাথ যাত্রার সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে ছবি তোলার চেষ্টা করে। আমরাও করলাম।



ভক্ত মানুষ ঐ সিঁড়িতেই মাথা ঠেকিয়ে অমরনাথকে প্রণাম জানাচ্ছে। যে কষ্টকর যাত্রা এ জীবনে আর কখনো হয়ে উঠবে না, সেখানে যে লক্ষ কোটি ভক্তের পদধূলি পড়েছে: সেই ধূলাই তো ভক্তের মাথায় উঠতে পারে। মনে মনে বাবা অমরনাথ কে প্রণাম জানিয়ে ফেরার পথ ধরলাম। এখানে ঝালমুড়িওয়ালার কাছে কুড়ি টাকার সাদা মুড়ি কিনেছি। আমাদের ড্রাইভার সেটা দেখেছে। তাই বলল, পাহেলগাঁ বাজারেই পাবে এ জিনিস। ফেরার সময়, পাহেলগাম সোজা না ফিরে উপরে একটা রাস্তা দিয়ে ঘুরে ফিরলাম। ঐ রাস্তায় প্রায় শ খানেক কটেজ আছে। বরফের সময় যেখানে স্কি করা হয়, সেটাও দেখলাম। হোটেলের সামনে , গাড়ী থেকে নামার সময় , ড্রাইভার মুড়ির দোকান দেখিয়ে দিল। এক প্যাকেট মুড়ি কিনে হোটলে ফিরে এলাম। বিকেলে নদীর উপর ব্রিজ পেরিয়ে উল্টো দিকের পাহাড়ের নিচে একটু ঘুরে এলাম। সন্ধ্যায় টিভি খুলে দেখি, নবান্নে জুনিয়ার ডাক্তারদের সাথে মুখ্যমন্ত্রীর মিটিং দেখাচ্ছে। চার মাস আগে থেকেই ঠিক করে রাখা কাশ্মীর ভ্রমণ করতে চলে গেলেও মন পড়ে ছিল, ধর্মতলায়। প্রবল প্রতিপক্ষের চোখে চোখ রেখে, ছেলে মেয়েদের জেদি বক্তব্যগুলো

শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল, কাশ্মীরে হয়তো আবারও আসব। কিন্তু সন্তানসম জুনিয়ার ডাক্তারদের এই মাথা উঁচু করে করা লড়াই, সারা জীবন মনে থাকবে। তোমাদের কুর্নিশ জানাই। ২৫.১০.২৪.



## রাঁচি ভ্রমণ

আগষ্টের প্রথমে, দুদিনের জন্য রাঁচি ঘুরে আসার জন্যে ট্রেনের টিকিট কেটে ছিলাম। তখন জানতাম না, 2024 সালের সেপ্টেম্বর এর প্রথম সপ্তাহে এমন একটা মন খারাপ করে দেওয়া অবস্থার সৃষ্টি হবে। ভারাক্রান্ত মন নিয়েই রাঁচি রওনা দিলাম। রাত নটা দশে হাওড়া থেকে ট্রেন। এই প্রথম মেট্রো ধরে দমদম থেকে হাওড়া এলাম। গঙ্গার নিচে দিয়ে মেট্রো যাচ্ছে বলে আলাদা কোন অনুভূতি হলনা। ট্রেনে বসার পর ছেলের ফোনে জানলাম, কলকাতায় এত সংখ্যায় মিছিল বেরিয়েছে যে, রাস্তা দিয়ে আসার চেষ্টা করলে হয়তো ট্রেন পেতাম না। এই রাতের হাওড়া হাতিয়া এক্সপ্রেস ট্রেনটি সকাল ছয়টার আগেই রাঁচি পৌঁছয়।

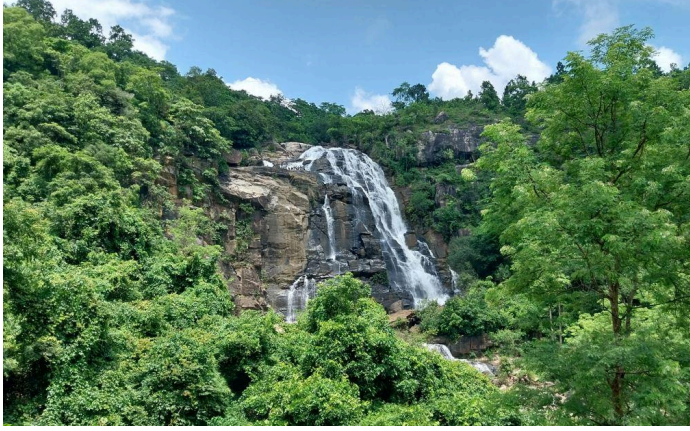
রাঁচি স্টেশনের থেকে বেরিয়ে বাম দিকে একশ মিটার মত হেঁটে গেলে অনেক হোটেল। আমাদের আগে থেকেই ঠিক করে রাখা হোটেলও ঐ একশ মিটার মত দূরেই ছিল। আমরা যদিও জানতাম হোটলে হেঁটেই যাওয়া যাবে, কি মনে করে একটা টোটোতে উঠে পড়লাম। সে বোকাটা আমাদের নিয়ে মেন রোডে চলে গেল। এক কিমি দূরে গিয়ে আমার মনে হল, কিছু একটা ভুল হচ্ছে। হোটলে ফোন করে আবার স্টেশনে ফিরে এলাম। হোটলে পৌঁছে আর এক সমস্যা। ওরা বলল, অনলাইনে হোটেল বুক করে এলে, দুপুর বারোটায় চেক ইন। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত সকাল সাড়ে ছয়টায় হোটেলের ঘরে ঢুকলাম। গাড়ীও আগেই ঠিক করা ছিল। আমরা সাড়ে সাতটার আগেই স্নান করে বেরিয়ে পড়লাম। গাড়ীর ড্রাইভারকে ( Driver Sonu Kumar : 7654086308) প্রথমেই জানিয়ে দিলাম, আমরা জলপ্রপাত দেখতেই বেশী আগ্রহী, মন্দিরে পূজা দেব না।

রাঁচির জলপ্রপাতগুলি সবই শহর থেকে দূরে দূরে।

আমরা প্রথমেই গেলাম, হুন্ডু জলপ্রপাত দেখতে। এটা শহর থেকে দেড় ঘন্টার রাস্তা। ৪৫ কিমি দূরে। রাস্তা বেশ সুন্দর। তার থেকেও যেটা বেশী ভালো লাগলো, রাঁচি শহর আর গ্রামের সবুজ। যেদিকে তাকাই শুধুই সবুজ গাছপালা। মাঝে বেশ কিছু শালের জঙ্গল। হুন্ডু জলপ্রপাতের সিঁড়ির কাছে পৌঁছানোর কুড়ি পঁচিশ মিটার আগে, গাড়ী থেকে নেমে টিকিট কাটতে হল।



গাড়ী পার্কিং এর জন্য কুড়ি টাকা, আর মাথাপিছু দশ টাকা করে টিকিট। গাড়ী থেকে নেমে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যেতে দুই পাশে আট দশটি চালা হোটেল। প্রতিটি হোটেলের সামনে খাঁচায় রাখা দেশী মোরগ। দেখলে মনে হয়, মুর্গীর মাংসের দোকান। এই সব দোকানে , চা, জলখাবার, ঠাণ্ডা পানীয় পাওয়া যায়। দুপুরের খাবারের অর্ডার দিয়ে নিচে নামলে ফিরে এসে মুর্গীর মাংসের ঝোল আর ভাত পাওয়া যায়। এই ছল্লু জলপ্রপাতে সাড়ে সাতশ মত সিঁড়ি নামতে হয়। সুন্দর পাথর বাঁধানো ছোট ছোট সিঁড়ি। নামতে কোন কষ্ট নেই। ওঠার সময় সবারই কষ্ট হবে। হাঁটুর ব্যথা থাকলে, বা বেশী বয়সে না নামাই ভাল। সিঁড়ি দিয়ে একটু নামলেই জল পড়ার প্রচণ্ড শব্দ শোনা যায়। একেবারে নিচে কয়েকটা দোকান আছে। এরা ঠাণ্ডা পানীয় বিক্রী করলেও চা রাখে না। জলপ্রপাতের জল যেখানে পড়ছে তার থেকে তিরিশ ফুট মত দূর থেকে দেখতে হয়। আমরা কিছু সময় থেকে , কিছু ছবি তুলে ফেরার রাস্তা ধরলাম। ওপরে উঠে একটা দোকানে চা খেয়ে গাড়ীতে ফিরে এলাম। আমাদের এত তাড়াতাড়ি ফিরতে দেখে ড্রাইভার ভাবল আমরা বোধহয় নিচে পর্যন্ত নামি নি। মাইল দুই ফেরার পর, ডান দিকের রাস্তা ধরে আরও এক কিমি মত চলে পৌঁছলাম সুবর্ণরেখা নদীর উপর গোটালসুদ ড্যামে। বাঁধের মাঝামাঝি গিয়ে , কয়েকটি ছবি তুলে গাড়ীতে ফিরলাম। এখান থেকে গাড়ী চলল বিয়াল্লিশ কিমি দূরে সীতা জলপ্রপাতের দিকে। সেই সুন্দর সবুজ প্রকৃতির ভেতর দিয়ে, এক ঘন্টা চলল গাড়ী। এখানেও গাড়ী রাখার জন্য আর আমাদের দুজনের জন্য টিকিট কেটে নিলাম। এখানে প্রায় কোন দোকান পাট দেখলাম না। এখানেও সবুজ গাছপালা ঘেরা বাঁধানো সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে হল।



সীতা জলপ্রপাত

সেই রকম প্রচণ্ড জলের শব্দ। এখানে নতুন আর একটা জিনিস ছিল, পনের কুড়ি জন ছেলের হৈ হৈ চিৎকার। কিছুটা নেমে দেখতে পেলাম, পাথুরে পাহাড়ের গা বেয়ে নামছে প্রবল জলের ঝর্ণা। অনেক উপরে, পাহাড়ের ধাপে অনেক ছেলে স্নান করছে আর হৈ হৈ করছে। আরও অনেক সিঁড়ি নেমে পুরো জলপ্রপাত দেখতে পেলাম। জল নিচে যেখানে নদীর মত বয়ে যাচ্ছে, কয়েকজন সেখানেও নেমে গিয়েছে দেখলাম। ওখানে যেতে হলে আরও একশ সিঁড়ি নামতে হয়। আমরা ওখানে নামলাম না। এরপর চললাম জোনা ফলস্ দেখতে। এটা মাত্র ছয় কিমি দূরে। এখানে টিকিট কেনার জায়গায় একসাথে গোটা চারেক গাড়ী এসে পড়ল। টিকিট নিল মাত্র কুড়ি টাকা। গাড়ীর জন্য টাকা নিতে ভুলে গেল নাকি! এখানেও বেশ কয়েকটি দোকান আছে। একটি দোকানে দুপুরের খাবারের কথা বলে জলপ্রপাতের দিকে এগোলাম।



জোনা

রাঁচি ২

জোনা জলপ্রপাতে নিচে নামতে ছয়শো সাড়ে ছয়শ সিঁড়ি নামতে হয়। সিঁড়িগুলি গাছপালার ছায়ায় ছায়ায় হলেও, একেবারে নিচে নেমে দেখতে হলে বেশ রোদে পুড়ে দেখতে হয়। এখানেও অনেক উপর থেকে জল পড়ার প্রচণ্ড শব্দ শোনা যায়। গোটা দুই বাঁধানো চাখল থেকে একটু উপর থেকেই গোটা জলপ্রপাত দেখতে পেলাম। নিচের চাখালে কয়েকজন ছবি তুলেছে দেখে আমরাও নামলাম। এখানে প্রপাতের জল এত কাছে যে জলের গুঁড়ো উড়ে এসে মোবাইল ভিজিয়ে দেয়। অনেকে আরও পঞ্চাশ সিঁড়ি নেমে জল ছুঁয়ে আসচে। আমাদের জল ছোঁয়ার উৎসাহ ছিল না। আস্তে আস্তে উঠে এলাম। আগের দুটি জায়গার থেকে এখানে যাত্রি একটু বেশী দেখলাম। সেটা হয়তো আগের দু'জায়গায় আমরা সকাল সকাল গেছলাম বলে। মিনিট দশেক বসার পর আমাদের খেতে দিল। গরম ভাত , শাল পাতার খালায়। চালা হোটেলে এর থেকে ভালো ব্যবস্থা আশা করলে হতাশ হতেই হবে। এরপর আমরা ফেরার রাস্তা ধরলাম।

রাঁচি শহর বেশ ছড়ানো। সকালে আমরা যেদিক দিয়ে বেরিয়ে গেছলাম এবার তার উল্টো দিক দিয়ে চললাম। এদিকে অনেক ফাঁকা ফাঁকা ময়দানের মত জায়গার ভেতর দিয়ে চওড়া রাস্তা। যে কোন শহরে গেলে সেখানকার দ্রষ্টব্য জিনিসগুলি দেখা ছাড়াও শহরের রাস্তা, রাস্তার পাশের গাছপালা সবই আমি মন দিয়ে দেখি। রাঁচি শহর বেশ সবুজ। শহরের ভেতরে অনেক গাছ আছে। গাড়ি একটা টিলার উপরে উঠে দাঁড়াল। টিলার উপরে জগন্নাথ মন্দির। বাইরে জুতো খুলে সিঁড়ি দিয়ে উঠলাম। ভেতরে ছবি তোলার কোন অনুমতি নেই। মন্দিরের দরজা বন্ধ ছিল। দশ মিনিট পর খুলবে জানাল। অন্য দিকের সিঁড়ি দিয়ে কিছুটা নেমে দেখলাম, ওটাই মূল প্রবেশ দ্বার। বেশ কিছু গাছের নিচটা সুন্দর করে বাঁধানো। অনেক যাত্রী গাছের ছায়ায় অপেক্ষা করছিল, আমরাও বসলাম। কয়েক মিনিট পর যাত্রীরা উঠে চলল মন্দিরের দিকে। আমরাও চললাম। পনের কুড়ি জন যাত্রীর পিছনে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে জগন্নাথ দর্শন হল। মন্দির থেকে বেরিয়ে গাড়ীর কাছে এসে, দূরে দেখলাম, নিচে রাঁচি শহর দেখা যাচ্ছে; ছবি তুললাম। চারটা নাগাদ হোটেলে ফিরে এলাম। সন্ধ্যায় বেরিয়ে শহরের বড় রাস্তায় এক চক্কর ঘুরে এলাম। হোটেলের টিভিতে কলকাতার খবর দেখে ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরদিন সকালে সাড়ে ছয়টার মধ্যে হোটেল ছেড়ে বেরোলাম। ড্রাইভারকে বলেই রেখেছিলাম, তাড়াতাড়ি বেরোব। আগের দিনের মত একটি ছোট দক্ষিণ ভারতীয় খাওয়ার এর দোকানে বসে ইডলী আর ধোসা খেয়ে গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করতে হল। সাড়ে সাতটায় গাড়ীতে উঠে চললাম , দশম জলপ্রপাত দেখতে। সকালে বিছানা থেকে নামার সময়ই বোঝা যাচ্ছিল, আগের দিন অনেক বেশি সিঁড়ি ওঠা নামা হয়েছে। পা এতো ব্যথা করছিল যে মাটিতে পা ফেলতে কষ্ট হচ্ছিল। পরের তিন চার দিন ওরকম ব্যথা ছিল পায়ে।

দশম জলপ্রপাত রাঁচি শহর থেকে পঁয়ত্রিশ কিমি দূরে। অনেকটা রাস্তা কলকাতার দিকে ন্যাশনাল হাইওয়ে ধরে এগিয়ে ছোট গ্রামের রাস্তা ধরতে হয়। এই গ্রামের রাস্তা প্রায় নির্জন। সবুজ প্রকৃতির ভেতর দিয়ে রাস্তা। এখানে কিন্তু জলপ্রপাত দেখতে কোন টিকিট কাটতে হল না। কয়েকটি দোকানপাট আছে। এখানেও নিচে পর্যন্ত নামতে শ' চারেক সিঁড়ি। মাঝে মাঝে বেশ কয়েকটি চাখাল আছে। কয়েক জায়গায় বসার জন্য বেঞ্চ আছে। এখানেও আমরা একেবারে নিচে পর্যন্ত নামলাম না। পঞ্চাশ সিঁড়ি মত বাকি ছিল। আমরা থাকতে থাকতেই কয়েকটি ছেলে

একেবারেই জলের কাছে নেমে গেল। আমরা বেশ কিছু ছবি তুলে গাড়ীতে ফিরে এলাম। এবার যাবো পাত্রাতু লেক। সেও ঘণ্টা দেড়েকের রাস্তা।



দশম

## রাঁচি ৩

পাত্রাতু যাওয়ার রাস্তাও বেশ সুন্দর। পাত্রাতু পৌঁছানোর মিনিট পনের আগে একটি সুন্দর জায়গা আছে; গাড়ী সেখানে দাঁড়াল। এটি পাত্রাতু ভ্যালি ভিউ পয়েন্ট। আরও কয়েকটি গাড়ীও দাঁড়িয়ে ছিল। কয়েকটা ফুচকার গাড়ী, ডাবের ঠেলা। নিচে আঁকাবাকা পাহাড়ী রাস্তা। অনেক দূর পর্যন্ত কালচে সবুজ উপত্যকা দেখা যায়। পাত্রাতু লেকও দেখা যায়।



কয়েকটা ছবি তুলে, একটা ডাব খেয়ে গাড়ীতে উঠে চললাম। পাত্রাতু লেকে ডোকার জন্য আধুনিক টিকিট কাউন্টারে টিকিট কেটে ঢুকলাম। সুন্দর সাজানো পার্কের ভেতর দিয়ে লেকের পাড়ে পৌঁছালাম। যে কোন বেড়ানোর জায়গার মত প্রচুর গুমটি দোকান, নৌকা ভ্রমণের নানান বন্দোবস্ত। স্পীড বোট, দাঁড় টানা নৌকা ইত্যাদি। আমরা খোঁজ নিয়ে জানলাম, এক ঘন্টা দাঁড়টানা নৌকায় চাপার খরচ পাঁচশ টাকা। আর দুজন যাত্রীর জন্য অপেক্ষা করলাম প্রায় এক ঘন্টা, পাওয়া গেল না। আমাদের এই বয়সে নৌকা ভ্রমণের জন্য বিরাট উৎসাহ ছিল না। শেষ পর্যন্ত গোটা পার্কে একবার ঘুরে গাড়ীতে ফিরে এলাম।



পাত্রাতু লেক

এরপর কোথায় যাওয়া হবে জানতে চাওয়ায় ড্রাইভার বলল, কাছেই একটা জলপ্রপাত আছে। দুপুরে খাওয়ার জায়গার কথা জানতে চাইলে ড্রাইভার জানাল, পাশের ছোট হোটেলেই মাছ ভাত পাওয়া যায়। পাশের গ্রামের

রাস্তা ধরে গাড়ী এগিয়ে চলল। তিন চার কিমি দূরে আর একটি জলপ্রপাত এর গেটে পৌঁছলাম। এখানে কোন টিকিট নেই। এটা পালানী জলপ্রপাত।



একশ মিটার মত রাস্তা হেঁটে পাহাড়ের নিচে পর্যন্ত পৌঁছলাম। রাস্তার পাশে পাশে বাগানের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু খুবই অল্প। সরু পাথুরে সিঁড়ি দিয়ে পঞ্চাশ সিঁড়ি মত নামতে হল। এখানেও দূর থেকে জল পড়ার প্রচণ্ড শব্দ। দশ বারোজন মত ছেলে ঝর্ণার জলে স্নান করছে দেখলাম। আমরা মিনিট দশেক থেকে কিছু ছবি তুলে ফেরার রাস্তা ধরলাম। গেটের কাছে একজন ভক্ত পৌঁছে গেল। গেটের বাইরে একটিই ঠেলা দোকান। সেখান থেকে বিস্কুটের প্যাকেট কিনে ভক্তকে খাওয়ান হল। পাটুর সেই হোটেলে ফিরে এলাম খাওয়ার জন্য। একেবারে চালা না হলেও রাস্তার পাশের অতি সাধারণ ভাতের হোটেল। মাছের ঝোল ভাত খেয়ে গাড়ীতে ফেরার রাস্তা ধরলাম।

ঘন্টা খানেক গাড়ী চলার পর ডাইভার জানাল, কাঁকে মেন্টাল হাসপাতাল আসচে। আমি ইউটিউবে দেখেছি, অনেকেই রাঁচি বেড়াতে গিয়ে এই কাঁকের হাসপাতালের গেটে ঘুরে আসে। আমার কাছে ব্যাপারটা অশ্লীল মনে হয়েছে। এটাতে দেখার কি আছে জানিনা! সাধারণ একটা রাস্তার পাশের হাসপাতালের গেট। রাস্তার একদিকে মহিলাদের আর অন্য দিকে পুরুষদের হাসপাতাল। আমাদের নামার কোন ইচ্ছাই ছিল না। এবার যে রাস্তা দিয়ে শহরে ঢুকলাম, সেই রাস্তায় বেশ গাড়ীর চাপ। শহরের ভেতরে একটি পার্কের বাইরে পৌঁছে গাড়ী থেকে নামলাম। এর নাম রক গার্ডেন। টিকিট কেটে ভেতরে ঢুকলাম। এটা একটা পাথুরে পাহাড়। নাম গোড্ডা হিল। পাথরের মাঝে মাঝে অনেক বড় বড় গাছ। পিছন দিকে এগিয়ে গেলে ওপর থেকে নিচে দূরে একটি বড় জলাশয়।

নাম কাঁকে ড্যাম। এখান থেকেই রাঁচি শহর এর জল সরবরাহ করা হয়। লেকের জলে কচুরী পানা ভাসচে। কয়েকটি নৌকায় লোকজন ঘুরছে। টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছিল, তবুও অনেক যাত্রী পাহাড়ে ঘুরছিল। আমরা ওখানে চল্লিশ মিনিট মত থেকে বেরিয়ে এলাম।

এরপর চললাম, টেগোর হিল। শহরের ভেতরে একটা গলির ভেতরে গাড়ী দাঁড়াল। একটা ছোট গেট দেখিয়ে ড্রাইভার ভেতরে যেতে বলল। কোন টিকিট কাটতে হল না। কিন্তু সিঁড়িগুলি বেশ অযত্নে পড়ে আছে। মেঘলা আকাশ, সিঁড়ি গাছের ছায়ায় ঢাকা। একটি বোর্ডে লেখা পড়ে জানলাম, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এখানে একটি বাড়ী করে অনেক বছর ছিলেন, একশ বছর আগে। এখন সেই বাড়ীতে কেউ থাকে না। বাড়িটা সম্ভবত এখন মেরামত করা হচ্ছে। প্রায় চারশ সিঁড়ি বেয়ে টিলার উপর উঠলাম। টিলার মাথা থেকে সবদিকে রাঁচি শহর দেখা যাচ্ছে।



টেগোর হিল থেকে রাঁচি

আমরা কিছু ছবি তুলে আস্তে আস্তে নেমে এলাম। আমরা আগেই জানতাম, বিকেলে ফিরে ঘন্টা পাঁচেক বসে থাকতে হবে। তাই স্টেশন রোডেই ফিরে এলাম। একটা সাধারণ হোটেলে ঢুকে পাঁচ ঘন্টার জন্য একটি রুমে ঢুকলাম। রাত নটা নাগাদ হোটেল ছেড়ে বেরিয়ে সামনের একটি হোটেলে রুটি খেয়ে স্টেশনের দিকে এগিয়ে গেলাম। রাত দশটায় ট্রেন। আমরা আধ ঘন্টা আগে পৌঁছালাম। গাড়ী কিন্তু পৌনে দশটায় এসে গেল। গাড়ীতে উঠে মিনিট দশেক বসার পর ঠিক সময়ে গাড়ী ছাড়ল। সকাল ছয়টা পনের নাগাদ সাঁতরাগাছি স্টেশনে গাড়ী ঢুকল। আমরা তৈরী হয়ে বসে থাকলাম। টিকিয়াপাড়া ছাড়ার পর গাড়ী প্রায় এক ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকল। বসে বসে অত্যন্ত হতাশ হয়ে গেলাম। প্রায় সাড়ে সাতটার পর গাড়ী হাওড়ায় ঢুকল। ফেরার সময়ও মেট্রো রেল ধরে দমদমে ফিরলাম। ১৪.৯.২৪.